ঠাকুর দয়ানন্দ।

অবতরণিকা।

বাঙ্গালাদেশের বুকের উপর দিয়া একটী তুফান বহিয়া যাইতেছে। কেহ দেখিতেছে, কেহ দেখিতেছে না, কেহ বুঝিতেছে, কেহ বুঝিতেছে না, কিন্তু দেশের স্থানে স্থানে একটী ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে ইহা সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী কোন ইন্দ্রজালের প্রভাবে হরিনামস্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে? দেশময় নামের নেশা কে ছড়াইল? এ স্রোতই বা কে বহাইল? কোথায় ইহার কেন্দ্রস্থল? কোন্ খানে ইহার সীমা? অনেকের প্রাণেই এ সমস্ত প্রশ্ন জাগিতেছে।

কেবল বাঙ্গালাদেশে নহে, সমগ্র জগতে এমন একটী বিপুল ধর্ম্মের স্রোত আসিতেছে যাহা, সর্ব্ববিধ জাতিগত, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভাসাইয়া দিয়া, বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ইতিহাসের গতিনির্দ্দেশ করিবে; অরুণাচল আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর দয়ানন্দ, কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই আশার সমাচার ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। 'অমৃতবাজার' এবং অন্যান্য পত্রিকায়, পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম ও প্রেরিত হইয়াছে। অত্যল্পকাল মধ্যে ধর্ম্মজগতে আশাতীত পরিবর্ত্তন দর্শনে, তাঁহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য বহুলোকের আগ্রহ জন্মিয়াছে।

গ্রামে গ্রামে তাঁহাকে নিয়া কত আলোচনা, কত আন্দোলন, কত কল্পনা-জল্পনা চলিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। কেহ কেহ শপথ করিতে প্রস্তুত, ইহা ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছু হইতেই পারেনা; কেহ কেহ মনে করেন, বাংলায় ইন্দ্রজাল কিম্বা বশীকরণ না বলিয়া যদি ইংরাজিতে হিপ্‌নটিজম্ (hypnotism) বলা যায়, তবেই সব পরিষ্কার হইয়া যায়, অনেকে

(বিশেষতঃ শিক্ষিতলোক এবং ইয়ুরোপীয়েরা) তাঁহার চোখের দিকে চাহিতে নিতান্ত সঙ্কুচিত ; কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহার হাতের কবচে কোন প্রকার গুপ্তশক্তির বসতি ; কেহ কেহ প্রত্যেক কার্য্যেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন ; কেহ কেহ বলিতেছেন,—এরূপ সুচতুর ব্যক্তি অল্পই জন্মিয়াছে—ইহার ভিতরে নিশ্চয় কোন ও গূঢ় অভিসন্ধি আছে ; কেউ জিজ্ঞাসা করেন—ইনি শাক্ত না বৈষ্ণব ?—আর মুসলমান শিষ্য ও না কি আছে ?—তবে কি ইনি জাতিভেদ মানেন না ? মাছ মাংস খাইয়া, ভোগবিলাসের মধ্যে কিরূপে সাধনা হইতে পারে, অনেকের নিকট একটা গুরুতর সমস্যা ; কেউ বা মনে করেন, ধর্ম্মটা ভাণ, মতলব স্বদেশী ; কাহারো কাহারো বিশ্বাস আশ্রমে আসিতে হইলেই, বিবেক জিনিসটা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয় ; কেবল কুৎসাপ্রচারের জন্য, একব্যক্তি নিজব্যয়ে একখানি পুস্তিকা ছাপিয়া বিতরণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন ; আবার অনেকে জিজ্ঞাসা করেন—তাঁহাতে অলৌকিকত্ব কি আছে ? ইত্যাদি। আর একদল আছেন—তাঁ'দের চক্ষে তিনি অবতার। তাঁহারা ঘটনার কষ্টিপাথরে শত শত বার তাঁহাকে পরখ করিয়া দেখিয়াছেন—শত শত বার তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার অপার প্রেমে তাঁহাদের জীবন অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছে, সে প্রেমের কাছে তাঁহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের কর্ম্মে নেতা, প্রাণের প্রাণ, সাধনের দেবতা।

এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী একশ্রেণীর লোক আছেন, ইঁহারা চিন্তাশীল এবং ইঁহারা ও যথার্থই জিজ্ঞাসু। শত শত শিক্ষিত লোক কোন্ আকর্ষণে ইঁহার পাছে ছুটিয়া আসে, আর কি দেখিয়া মুগ্ধ হয়, সারা জীবনের শিক্ষা

দুর্দিনে কিসে ভুলিয়া যায়, কি আশায় সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে ঘুরিতেছে, ইহাদের মনে এ সমস্ত প্রশ্ন উঠিয়াছে। কত বাধাবিঘ্ন আসিল কিন্তু কিছুতেই তাঁহার গতিরোধ হইল না। কত সংশয়, অবজ্ঞা ও পরিহাসের মধ্য দিয়া দাবানলের মত তাঁহার প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সবিস্ময়ে ইহা ও দেখিতেছেন। এক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার নাম পর্য্যন্তও শুনেন নাই তিনি কি সাহসে, কিসের বলে শতবিধ নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া অকুতোভয়ে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন—তাঁহার জীবনের ইতিহাস ও কার্য্যপ্রণালী, চরিত্র, মতামত, আশা ও আদর্শ কিরূপ জানিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের মনে যথার্থই কৌতূহল জাগিয়াছে। এই শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই এ পুস্তকের অবতারণা। তাঁহাদের নিকট নিবেদন এই, তাঁহারা যেন প্রথমেই অবতারবাদ নিয়া বিচার করিতে না বসেন। তিনি অবতার কিনা তাহাতে কি আসে যায়? তাঁহার মানবভাবে আপনার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতেছে কি না, তাঁহার জীবন ও মতামতে চিন্তার বিষয় আছে কি না, তাঁহার চরিত্রে আপনার হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে কিনা, ইহাই বিবেচনার বিষয়। ঠাকুর নিজে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

> "অবতার খুঁজিয়া আমাদের দরকার কি? প্রাণের মানুষ চাই, যেখানে গেলে প্রাণের পিপাসা মিটে সেইরূপ মানুষ চাই।"

এ কথাটি যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন। আমি তাঁহার চরিত্রের কণামাত্র ও বুঝি নাই—যতই বুঝিতেছি, যতই দেখিতেছি ততই মনে হইতেছে

এখনও কিছুই বুঝি নাই। কিন্তু তিনি কৃপা করিয়া যতটুকু দেখাইয়াছেন, যতটুকু বুঝিতে দিয়াছেন তাহাতেই মনে হইতেছে, সকলকে ডাকিয়া বলি—ওগো তোমরাও দেখিয়া যাও, তোমাদের প্রাণের অভাব এখানে পূর্ণ হয় কিনা দেখিয়া যাও। তাঁহার অমৃতমাখা চরিত্রে নানা বিচিত্র ভাবের সমাবেশ—তুলিকার দোষে চিত্র যদি মলিন হয়, চরিত্র আপনার জ্যোতিতেই উজ্জ্বল থাকিবে।

ঠাকুরের চরিত্র।

বর্ত্তমান জগতের দিকে যখন তাকাই মনে হয়, একটা বিশাল অতৃপ্তির কালসাপ তাহার মর্ম্মে দংশন করিয়াছে। সে উন্মত্তের মত কোথায়—কি আশায় ছুটিয়াছে জানে না। নিত্য নব ভাব, নিত্য নব বেশভূষা, নিত্য নব আকাঙ্ক্ষা, নিত্য নব আবিষ্কার!—কিন্তু প্রাণ কি চায় জানে না, দারুণ পিপাসার ঘূর্ণিপাকে তাহাকে কোথায় নিয়া যাইতেছে এ প্রশ্নটী পর্য্যন্ত মনে উঠে না।

বর্ত্তমান সমাজ বহির্ম্মুখ।

এ যুগের দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ—অসংখ্য মতবাদ আর পারিভাষিক শব্দের বোঝা বহিয়া তাহার কিম্বা জগতের কতটুকু কল্যাণ হইবে, বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ—আকাশের তারার উপাদান কিম্বা পরমাণুর পরস্পর সংস্থান না জানিলে তাহার কি ক্ষতি হইবে, আমেরিকার বহুক্রোরপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ—তাহার সঞ্চিত-ভাণ্ডার মিনিটে মিনিটে যদি লক্ষ মুদ্রা প্রসব না করে তবে তাহার শান্তির কি ব্যাঘাত হইবে, বিলাসিনী পাশ্চাত্য মহিলাকে জিজ্ঞাসা

করিয়া দেখ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পোষাক বদলাইয়া তাহার কতটুকু সুখ বাড়িতেছে—সকলেরই উত্তর প্রায় একরূপই হইবে। সকলেই নিতান্ত অবজ্ঞার হাসি হাসিবে—মনে মনে ভাবিবে তুমি নিতান্ত "আনাড়ী," এই সমস্ত নিয়াই জগতের উন্নতি—তোমার এতটুকু জ্ঞানও নাই।

ইতিহাসে এমন সময় আসে, যখন মানুষ ঘরের দিকে দৃষ্টি না করিয়া জগৎময় সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়, একটা অর্থহীন কর্ম্মের আবর্ত্ত তাহাকে তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়। "কিসে সুখ? জীবনের লক্ষ্য কি? এর পর কি?" এই সমস্ত গোড়ার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার তাহার অবসর থাকে না, আর সোজা কথা সোজাভাবে দেখিবার শক্তিই থাকে না। এইরূপ সময়ে এক একটি লোক আসেন, তাঁহারা নির্ভয়ে গোড়ার প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন, প্রচলিত রীতিনীতি কিম্বা মতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদের আত্মা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাঁহারা সমাজের মাপকাটিগুলিও মাপিয়া দেখিতে চাহেন। সেই অচেনা কণ্ঠস্বর শুনিয়া সমাজ শিহরিয়া উঠে—কেউ তাঁদেরে উন্মাদগ্রস্ত ভাবে, কেউ কল্পনাপ্রবণ মনে করে, চারিদিকে কলরব উঠে এরা অতি ভয়ঙ্কর লোক, সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, স্থানবিশেষে নির্য্যাতনের চেষ্টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয় সেই দিন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "হায়! হায়! আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চলিয়াছি"—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা বলুনতো আপনার জীবনের লক্ষ্য কি?" দু তিন কথায় বুঝাইয়া দিলেন—মানবজীবনের লক্ষ্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ; আর

তিনি প্রত্যেক বিষয়ে গোড়ায় যাইতে চাহেন।

যতদিন লক্ষ্য স্থির না হইয়াছে ততদিন শিক্ষা, সেবা, সাধনা সব ব্যর্থ হইতেছে, কারণ কার্য্যের সফলতা মাপিয়া দেখিবার মাপকাটিই হাতে নাই। তিনি শিক্ষিত অশিক্ষিত শত শত ব্যক্তিকে সেই একই প্রশ্ন করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সন্তোষজনক উত্তর কারও মুখে শুনি নাই। ততোঽধিক আশ্চর্য্যের বিষয় মানুষ যে আনন্দ চায় এই একান্ত সহজ কথাটি অনেক শিক্ষিত লোকের মাথায় প্রবেশ করাইতে গিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। এত বড় প্রশ্নের যে এত সোজা উত্তর হইতে পারে, একথা ভাবিতেই তাহারা নিতান্ত কুণ্ঠিত; একথা তো যে সেই বলিতে পারে, এতে আর নূতনত্ব কোথায়?

ঠাকুরের চরিত্রের বিশেষত্ব এই, একেবারে গোড়ায় না গিয়া কোনও প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চিন্তাই তাঁহাব প্রাণে আসে না, আর যিনি যত বড় কথাই বলুন না কেন কোনও প্রকার বাঁধাবুলিতেই তিনি আবদ্ধ নহেন।

তিনি বলিতেছেন শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া অজস্র ধনাগম হউক, গ্রামে গ্রামে শিক্ষার বন্দোবস্ত হউক, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অকাতরে অর্থব্যয় কর, সমাজের উন্নতি হইতেছে কিছুতেই প্রমাণ হইবে না। সমাজের দশজনের সুখের মাত্রা বাড়িতেছে কি না দেখিতে হইবে, প্রত্যেক কার্য্যের সফলতা ইহারই আলোকে বিচার করিতে হইবে। কিন্তু আতসবাজীর আলোকের মত ক্ষণস্থায়ী সুখ চাহি না, যাহাতে পরমুহূর্ত্তেই অবসাদ আসে সে সুখ চাহি না, প্রাণে ঘননির্ম্মল আনন্দধারা প্রবাহিত হওয়া চাই, জীবন

তাঁহার লক্ষ্য ও জীবনের কাম্য।

একটী আনন্দের সঙ্গীতে পরিণত হওয়া চাই—ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ইহাই মানবজীবনের লক্ষ্য।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন, কেবল তিনি নিজে নয় সমগ্র জগতের লোক যাহাতে ইহাকেই লক্ষ্য রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয় তাহাই করিতে হইবে। একটি লোকও যদি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ করিতে পারে, তবে তাহারই আনন্দ চারিদিকে বিকীর্ণ হইবে। যাহা কিছু লক্ষ্যের সহায় তাহাতেই উন্নতি—আর সব আবর্জ্জনা। পর্ব্বতপ্রমাণ আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া মানুষের চিত্তকে স্বাধীন করিতে হইবে—মানুষের বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিতে হইবে।

কত বড় কথা! কত বড় চিন্তার সাহসিকতা! কয়টা লোকে এত বড় কথা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে, এত বড় কথা ভাবিবার সাহসই বা কয়টা লোকের আছে?

ছান্দোগ্যের ঋষি যখন বলিয়াছিলেন "ভূমাতেই সুখ—অল্পে সুখ নাই" তিনি একটা উচ্ছ্বাস কিম্বা মুহূর্ত্তেকের আবেগে একথা বলেন নাই, অকাট্য যুক্তি পরম্পরায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ঠাকুরেরও প্রাণগত ভাব এই, অতল জলে ডুবিতে হইবে, যিনি অমৃতময় অন্তরে তাঁহাকেই বসাইতে হইবে—বহির্ম্মুখ লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজের মর্ম্মস্থলে ভগবানকে বসাইলেই শান্তি আসিবে। তিনি ইহারই জন্য সংসারে আসিয়াছেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "মহাশয়, আপনার জীবনের কার্য্য কি তাকি আপনি জানেন?" ঠাকুর ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন "জানি বৈ কি।" লক্ষ্য স্থির না করিয়া তিনি কার্য্যে অবতীর্ণ হন নাই।

লক্ষ্যের প্রতি এইরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা আছে বলিয়াই তিনি কোনও নিয়ম কিম্বা প্রণালীর দাস নহেন। লক্ষ্য স্থির থাকা চাই কিন্তু নিয়ম নিষ্ঠার অর্থ কি? নিয়ম মানুষের দাস, মানুষ নিয়মের দাস নয়। অতিরিক্ত নিয়ম নিষ্ঠাতে মানুষ লক্ষ্য ভুলিয়া যায়,—তাহার অন্তর্দৃষ্টি মলিন হইয়া যায়, বাহ্য অনুষ্ঠান তখন ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় ঠিক এইরূপ সময়েই এক এক জন মহাপুরুষ আসিয়া আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কার করিয়া যান। ঠাকুর অনেক সময় বলিয়াছেন :—

লক্ষ্যে অবিচলিত নিষ্ঠা।
(১) তিনি নিয়মের দাস নহেন।

"এদেশে ধর্ম্মের আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে ; আচার তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। মনুষ্যত্ব দেখিয়া বিচার করিবার শক্তি নাই,—মালা তিলকাদি ধর্ম্মের বাহ্যিক বেশভূষা দেখিয়াই লোকে সাধুতার বিচার করিতে বসে। এ স্রোত সম্পূর্ণ রূপে ফিরাইতে হইবে। বাহিরের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি পড়িলে লোকে ভিতরের দিকে যাইতে চাহিবে না। আমি একদল সন্ন্যাসী গঠন করিয়া যাইব, যাহারা জীবনে পূর্ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ভারতে চিম্‌টা কমণ্ডলুর আদর উঠিয়া যাইবে।"

দেশকাল অবস্থা ভেদে পদে পদেই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবে—পাঁচ হাজার বছরের "পুরাতন মদ নূতন বোতলে" ঢালিতে যাওয়া বাতুলতা! তাঁহার চির স্বাধীন আত্মা কোনও প্রকার নিয়মনিগড়েই আবদ্ধ নহে।

গানের সময় তাল মানের দিকে একবারেই দৃষ্টি থাকে না। তিনি বলেন "আমি ভাব চাই, তালমান চাই না।"

বেশভূষাতে লোকের অশ্রদ্ধা হইবে জানিয়া অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই বিলাসিতার মাত্রা বাড়াইয়া থাকেন।

"আমি মালা তিলকের দ্বারা সমাজে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই না। রেশমের আলখেল্লা পরিয়াও মাটীতে গড়াগড়ি দেওয়া যায় লোকে তাহা দেখুক।"

রাত্রে হাটিয়া যাইতেছেন, কিন্তু দিনে হয়তঃ গাড়ী ছাড়া চলেন না। এতেই যার অশ্রদ্ধা হইয়া যায় তেমন লোক্‌কে দিয়া কোন্ কাজ হইবে? তিনি যেখানেই প্রচারে গিয়াছেন চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া দিয়া আসিয়াছেন—যেখানে তেমন আন্দোলন হয় নাই, বুঝিয়াছেন সেখানে কোনও কাজ হয় নাই। তিনি বলেন—

(২) তিনি আমূল সংস্কার চাহেন।

"আমার বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হউক—আমি সহজ সংস্কার চাই না,—আমূল সংস্কার চাই। আন্দোলন যতই তীব্র হইবে, মানুষ ততই গোড়ায় যাইতে চেষ্টা করিবে, সংস্কারের ভিত্তি ততই দৃঢ় হইবে, ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় সত্য একদিন প্রকাশিত হইবে।"

খবরের কাগজে আমার সাধনাবস্থার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহিলে তিনি আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন। কোন প্রকার প্রণালীবদ্ধ

সাধনারই তিনি পক্ষপাতী নহেন। প্রকৃতি ভেদে প্রত্যেকের জন্য তিনি বিভিন্ন সাধন প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অনেক সময় বলিয়াছেন বিশ্বাস থাকিলে —মনের বল থাকিলে সাধনার প্রয়োজন নাই।

(৩) প্রকৃতিভেদে সাধনপ্রণালী বভিন্ন, কিন্তু ভগবৎ নিষ্ঠাই মূলমন্ত্র।

সময়ান্তরে বলিয়াছেন—

"কেবল তাঁকে মা মা বলিয়া ডাক, আর কিসের সাধন ভজন? তাঁর প্রতি যদি নিষ্ঠা থাকে, তবে মাছ মাংস খাও, যাহা ইচ্ছা কর কিছুতেই পতন হইতে পারে না। অভিমান ছাড়া আর কিছুতেই সাধকের পতন হয় না। যতক্ষণ মনে থাকিবে আমি কিছু নই, আমি তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র ততক্ষণই এক 'বৃহৎ আমি' তোমার পাছে রহিয়াছেন অনুভব করিতে পারিবে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অহঙ্কার মনে আসে, সেই মুহূর্ত্তে 'ছোট আমি' ফিরিয়া আসিবে। কামিনী কাঞ্চন না ছাড়িলে যদি ধর্ম্ম না হয় তবে জগতের কোটী কোটী লোক কখনই ধর্ম্মপথে আসিবে না। আমি পূর্ণতা চাই, ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় চাই, সাংসারিক জীবনের সঙ্গে পারমার্থিক জীবনের বিচ্ছেদ দূর করিয়া দিতে চাই। এ যুগের মানুষকে সবলচিত্ত হইতে হইবে। ভোগ

ছাড়িবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ত্যাগ সঙ্গে রাখিতে হইবে। ভোগও তাঁহার, ত্যাগও তাঁহারই। প্রাণের ভিতর যদি তাঁহারই আলোক জ্বলে, প্রতি কার্য্যের মধ্যে যদি তাঁহারই খেলা, তাঁহারই আনন্দ দেখি তবে, ভোগ ও বন্ধন হইবে না। অনাসক্তিই ত্যাগ—অনাসক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাস—অনাসক্ত হইয়া কামিনী কাঞ্চনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

ইস্কুলের লেখাপড়া অতি অল্পই শিখিয়াছেন।—'অমিয়-নিমাই চরিত' পড়িতে পড়িতে পুস্তকের পাতা ভিজিয়া গেল—পড়া আর হইল না। পুস্তক তিনি অতি অল্পই পড়িয়াছেন; কিন্তু প্রগাঢ় চিন্তায় বড় বড় দার্শনিককে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন; সঙ্গীতের আলোচনা অতি

স্বভাবদত্ত প্রতিভা।

অল্পই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সংকীর্ত্তনে দেশ পাগল হইয়া উঠিতেছে; কবিতা লেখা কখনও অভ্যাস করেন নাই, কিন্তু গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা, বৈষ্ণব কবির মধুর ভাষায় অনায়াসে লিখিয়া গিয়াছেন; নিয়মিত সাধনা অতি অল্পই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্পর্শ মাত্রে কত লোকের সাধক জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার চরিত্রে এত বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ হইয়াছে—গাম্ভীর্য্যের

বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ।

সঙ্গে এত চপলতা যে একাধারে থাকিতে পারে—না দেখিলে বিশ্বাস করা অসম্ভব।

শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলের সঙ্গে কথায় কথায় কৌতুক, পরিহাস—কথায় কথায় রসিকতা উছলিয়া পড়িতেছে, কৌতুকচ্ছলে লোকের

মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন—আর চারিদিকে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। কেহ হয়তঃ মনে মনে অবিশ্বাস করিতেছে, কিন্তু সঙ্গ ছাড়িতেও কষ্ট বোধ করিতেছে—ঠাকুর তখন একতারা হাতে নিয়া গান ধরিলেন "যাব না সজনী আর সে দেশে, যে দেশের মানুষের সঙ্গে মন নাহি মিশে" প্রতি কথার নানা অর্থ—নানা জনে নানা ভাবে নিতেছে—আর সকলেই ভাবিতেছে, আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথাটি বলা হইল; কিন্তু তাঁহার একটি কথাও নিরর্থক হইতেছে না—প্রত্যেকের কথা, প্রত্যেকের ভাব তিনি লক্ষ্য করিতেছেন, একজনকে পরিহাসচ্ছলে সাবধান করিয়া দিতেছেন আর সকলেই নিজ নিজ ত্রুটি সারিয়া নিতেছে।

(১) একাধারে চপলতা ও গাম্ভীর্য্য।

একটা লীলাস্মিত তাঁহার প্রতি কার্য্য, প্রতি হাবভাবকে সরস করিয়া তুলিতেছে। দেখিলে মনে হয়, এমন চপল লোক সংসারে অতি অল্পই আছে।

শিশুদিগকে তিনি বড় ভালবাসেন, তাহাদিগকে কোলে নিয়া কত আদর করেন, কত স্নেহমাখা কথা কহেন, কত ছড়া বলেন। কোনও দিন নিজ হস্তে ছোট ছোট বালিকাদের পায়ে আলতা দিয়া তাহাদিগকে "ভগবতী" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করেন। শিশুরা নিঃসঙ্কোচে ধূলিমাখা দেহে তাঁহার কোলে উঠে।

কিন্তু যখন কোনও গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত, যখন কোনও কর্ত্তব্য করিতে হইবে, কিংবা কেহ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছে, তখন তাঁহার মুখে অপরূপ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠে, অতি সবলচিত্ত পুরুষেরও তখন কথা বলিতে ভয় হয়, তাঁহার সম্মুখে চপলতা করে কিংবা তাঁহার শক্তিপূর্ণ আদেশবাণী অমান্য করে কার সাধ্য?

সাধনা কিংবা দীক্ষার সময় তাঁহার নগ্নদেহ, সৌম্যমূর্ত্তি, অশ্রুসিক্ত মুখের প্রশান্তভাব দেখিলে কার না মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত হয়? বাণিয়াচুঙ্গে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "বিরুদ্ধবাদীরা যদি আপনাকে আক্রমণ করে তবে কি হইবে?" তিনি যখন প্রলয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমাদের মধ্যে কার এত সাহস যে আমার গায়ে হাত তুলিতে পারে?" উপস্থিত সকলের প্রাণ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। "কালা সময় বুঝ না—অসময়ে বাঁজাও বাঁশী প্রাণ তো মানে নারে কালা" এই সব চিরপরিচিত গ্রাম্য গান গাহিতে গাহিতে যে একজন লোক কাঁদিয়া আকুল হইতে পারে লোকে ইহার মর্ম্ম কি বুঝিবে?

(২) মধুরভাষী অথচ স্পষ্টবাদী।

এমন মধুরভাষী লোক যে এত স্পষ্টবাদী হইতে পারে কে বিশ্বাস করিবে? "জগৎ জুড়িয়া কথা কও, আর চাম্‌চিকার মত ডাক দেও" ঠাট্টা তামাসার মধ্যে সহসা এই কথা বলিয়া তিনি একজন বাল্যবন্ধুকে চুপ করিয়া রাখিয়াছিলেন। "নিজের ভাবনা নিয়াই রাতদিন ব্যস্ত—আবার মুখে বড় বড় কথা আছে—দেশের কাজ করিবেন—জগতের কাজ করিবেন।" এই ভাবের কথা বলিয়া তিনি কত লোককে অপ্রতিভ করিয়াছেন। যিনি শিষ্যদের নিকট পত্রাদিতে "প্রাণের—" বলিয়া সম্বোধন করেন, নিজের নামের পূর্ব্বে লেখেন "তোমারই" কিংবা "তোমাদেরই", তিনিই আবার প্রয়োজন হইলে কিরূপ কঠোর শাসন করিতে পারেন দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়।

কেহ প্রণামের ছড়াছড়ি কিংবা অতিরিক্ত ভক্তি দেখাইলে তাহাকে নানারূপে লাঞ্ছিত করিতেছেন—বলিতেছেন "মনে ভাব থাকিলে বাহিরে দেখাইবার প্রয়োজন কি? কার কিরূপ মনের ভাব তা' কি আমি বুঝি না?" আবার কখন প্রণাম করিতে হইবে, কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিবেনা তাহাও নিজেই শিখাইয়া দিতেছেন।

(৩) বাহ্যভাবের প্রতি উদাসীন, কিন্তু শিষ্টাচারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য আছে।

তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিবার পর একজন শিষ্য প্রণাম করেন নাই—তাহাকে সকলের সাক্ষাতে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই যে আমাকে প্রণাম করিলে না।" তিনি প্রণাম করিতে যাইতেছেন, তখন বারণ করিয়া বলিলেন "আমি কি তোর প্রণামের ভিখারী? তোদের স্বভাব খারাপ হইয়া যাইতেছে এই আমার কষ্ট।"

সামান্য লোকের সঙ্গে ব্যবহারে ও বিনয়ের অবতার। "আমি কি করিতে পারি—মা যে ভাবে নাচাইতেছেন, আমি সেই ভাবে নাচিতেছি; আমার কি কোনও শক্তি আছে, একটা পাগলের পাগলামি করিয়া যাইতেছি।" নাম প্রচারে গিয়া বলেন, 'নাম শুনিতে আসিয়াছি;' যারা শিষ্যানুশিষ্য হইবারও উপযুক্ত নয় অনেক স্থলে তাহাদিগকেও প্রণাম করিতেছেন—বিনীত ভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু কেহ কোনও বড় লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার অনুরোধ করিলে বলেন "বড় লোক কে? বড় লোক দিয়া আমার প্রয়োজন কি? তিনি কি নিজে আসিতে পারেন না?" কাহারও মনে অশ্রদ্ধা কিম্বা অভিমানের লেশমাত্র থাকিলেও তিনি

(৪) একাধারে বিনয় ও আত্ম-সম্মান বোধ।

তাহার আতিথ্য গ্রহণে নিতান্ত কুণ্ঠিত—কোনও বড় লোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন কিংবা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; বলিয়া তিনি কোনও দিন কিছুমাত্র গর্ব্ব বোধ করেন নাই। প্রধান প্রধান শিষ্যকেও অনেক সময় বলিয়াছেন, "তোমার ইচ্ছা হইলে এখনই চলিয়া যাইতে পার।" গুরুতা আজ কাল একটা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে—এই শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আজ কাল তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন এ কথা বলিতেই নিতান্ত লজ্জিত বোধ করেন।

(৫) আত্মগোপন।

তাঁহার মত আত্মগোপনের শক্তি জগতে অতি অল্প লোকেই দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবনে শত শত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে—প্রকাশ করিলে একখানি মহাভারত হইয়া যায়—কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তগণও তাহার অতি অল্পই জানেন—বাহিরের লোক তো ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ঘরের কাছের লোকে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়াও বুঝিতে পারে নাই, ইনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ। অধিকাংশস্থলে তিনি ইচ্ছা করিয়াই লোকের চক্ষে এমন ভাবে ধূলি দিয়াছেন, যে লোকে সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই, তাঁহাতে কোনও বিশেষত্ব আছে। অধিকাংশ লোকের এখনও বিশ্বাস—স্বামী হংসানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ তাঁহার চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সংকীর্ত্তন ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোনও শক্তি আছে, এখনও অতি অল্প লোকেই একথা ভাবে; স্বামী চিদানন্দ কয়েক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার বাসায় থাকিয়াও মনে করিতেন ইনি একজন বড় দরের Spiritualist। প্রথম দর্শনে গুরুদাস বাবুর (দেবানন্দ) অশ্রদ্ধা এমন কি অবজ্ঞা হইয়াছিল। সে ভাব দূর হইতে বহুদিন লাগিয়াছিল। অন্যান্য

অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ (প্রণবানন্দ) তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়াও বুঝিতে পারেন নাই, ইনি যথার্থই একজন মহাপুরুষ না একজন ঐন্দ্রজালিক। তিনি বলিয়াছিলেন "লোকে আপনাকে চিনিতে পারিতেছে না, তাই নিন্দা করে। এই নিন্দার জন্য আপনি দায়ী কি মানুষ দায়ী বুঝিতে পারিতেছি না!"

এত শক্তি সত্ত্বেও একজন মানুষ কি করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও এত নিন্দা হজম করিতে পারে, বুঝিতে পারি না। রাধিকা বাবু (সত্যানন্দ) বহুদিন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই, ইনি তার চেয়ে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি যখন কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "আমাকে পথ দেখাইয়া দাও," তখন ঠাকুর বলিয়াছিলেন "তুমি কি পাগল হইলে? দুজনে এক রাস্তার পথিক। এক অন্ধ কি অন্য অন্ধকে পথ দেখাইয়া দিতে পারে?" একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "এতদিন আমি বেশ গোপনে ছিলাম, তুই প্রকাশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিলি!" তাঁহার স্পর্শমাত্র আমার জীবনের স্রোত ফিরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন—যেন আমি অনেক বিষয়েই তার চেয়ে বেশী জানি এবং বেশী বুঝি। অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট কিছুমাত্র সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই—অনেক সময় সংশয় হইয়াছে তিনি নিজেই বুঝিয়াছেন কিনা; পরে কোনও ঘটনার ভিতর দিয়া খেলার ছলে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তখন সেই কথার উল্লেখ করিয়া হাসিয়া লজ্জা দিয়াছেন। তিনি কি জানেন কিংবা কি করিতে পারেন এখনও তাহার কণামাত্র বুঝিতে পারি নাই। প্রতিদিন বিস্ময়ের উপর বিস্ময় আসিতেছে।

(৫) ক আত্ম-প্রকাশ।

কিন্তু আত্মগোপন অপেক্ষা তাঁহার আত্মপ্রকাশের প্রণালী অধিকতর বিস্ময়কর! কোনও একটা ক্ষুদ্র ঘটনায় প্রথমে সন্দেহ, পরে অবিশ্বাস, তারপর কোনও নূতন ঘটনায় সন্দেহ আবার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। গুরুদাস রাহা, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির লিখিত বিবরণে ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই এইরূপ হইয়াছে। এমন ভাবে ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে, যেন কিছুতেই তাঁহাকে ধরিয়াও ধরা যায় না, অথচ তিনি পদে পদে অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাইয়া যাইতেছেন। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পদে পদে ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু আবার কোনও একটা ক্রিয়ায় কিম্বা কথায় সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিতেছেন। এমন অপূর্ব্ব, এমন কৌতুককর, এমন শিক্ষাপ্রদভাবে একটা খেলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ হইতে পারে, না দেখিলে কল্পনা করাও অসম্ভব হইত। তাঁহার আত্মগোপনে ব্যক্তিগত চিন্তার লেশমাত্র নাই। উপযুক্ত সময়ে কি ভাবে কতটুকু প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহাও তিনি নিজেই বলিয়া দিতেছেন। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, সংশয় অবিশ্বাসের ভিতর দিয়া মানুষকে গঠিত করিয়া লওয়া—হৃদয়ের বল বিশ্বাসের শক্তি বাড়ানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন প্রতিক্রিয়া ছাড়া হৃদয়ের বলই বাড়িতে পারে না। সুতরাং প্রতিক্রিয়াতে তিনি কখনই অসন্তুষ্ট নহেন। কিন্তু যখন দেখেন অবিশ্বাসে কেহ দারুণ অশান্তি ভোগ করিতেছে, তখন সে মুখে কিছু না বলিলেও নিজেই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কখনও সস্নেহে মধুর ভৎসনায়, কখনও ঘটনানিচয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইয়া, কখনও

মানসিক অবস্থার উপযোগী ক্রিয়ার দ্বারা বিশ্বাস দিতেছেন, এবং বিশ্বাস যে পরিমাণে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, সেই পরিমাণে উচ্চ চিন্তা এবং শক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

যুগোপযোগী ভাব।
(১) উদারতা।

বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ভাব তাঁহাতে অত্যধিক পরিমাণে আছে। তাঁহার মত উদারতা সংসারে বিরল। তিনি নিজ শিষ্যাদিগকে পর্য্যন্ত মাতৃভাবে প্রণিপাত ও পূজা করিয়াছেন। ঢাকা আব্দুল্লাপুরে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাতে শাস্ত্রোক্ত সদ্‌গুরুর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান, এইরূপ মত প্রকাশ করায় তিনি বলিয়াছিলেন "গুরু হওয়া ত দূরের কথা—আমি এখনও শিষ্য হইবার উপযুক্ত হই নাই," এবং ইহা যে যথার্থই তাঁহার অন্তরের কথা দেখাইবার জন্য, সর্ব্বসমক্ষে প্রিয়শিষ্য রাধিকানাথের পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে এমন প্রশস্তচিত্ততা সংসারে কয়জন দেখাইয়াছে? সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান হইয়াও তিনি অনেক উপেক্ষিত শ্রেণীর লোকের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের নিকট প্রেমভক্তি ভিক্ষা চাহিয়াছেন। তাঁহার এই অত্যধিক দৈন্য বুঝিতে না পারিয়া পরে অনেকে ইহার জন্য অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

তাঁহার চিন্তা এত মৌলিক এবং প্রগাঢ় যে সংসারে দুটি লোকের সঙ্গেও তাঁহার মতে মিল আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি নিজে যেমন স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেও তেমনি কুণ্ঠিত। একটী ছাত্রের নিকট

এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া যাহা ভাল বুঝ তাহাই করিবে। প্রত্যেকের একটী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, তাহার উপর আমি কখনও হস্তক্ষেপ করি না।" শিলচরের ডেপুটী কমিসনার যখন গুরুদাস রাহা ও অখিলচন্দ্র গুপ্তকে আশ্রমের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন, তখন তাহারা ঠাকুরের নিকট পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি ইহার কি বলিব? নিজের বিবেক যাহা বলে, নিজে যাহা ভাল মনে কর তাই করিয়া যাও।" বিভিন্ন প্রকৃতির শত শত লোক তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে।

(৩) মতের স্বাধীনতা।

মতের অনৈক্যের জন্য তাঁহাকে কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, এমন কি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তেও অনেকে তাঁহার প্রতি ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করিয়াছে—আর তিনি তাহাদিগকে বুকে লইয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন, এ দৃশ্য কতবার দেখিয়াছি। ঢাকার একজন জ্যোতিষী দুতিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত কুতর্ক করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে এমন মধুরভাবে তাহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন যে সে লোকটী অবশেষে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া তাঁহার শরণাগত হয়। যিনি সংসারে ভগবান ছাড়া আর কিছু জানেন না—ভগবানকে সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, কোনও নাস্তিক কিম্বা সংশয়-বাদী কখনও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই; বরঞ্চ তাহাদের মতের মধ্যে যেটুকু সত্যের ভাগ আছে, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা স্বীকার করিয়া-

ছেন। কেবল তাঁহার অচল স্থৈর্য্য দেখিয়াই অনেকের মতি ফিরিয়া গিয়াছে।

সরল বিশ্বাসে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি আরও অধিক সন্তুষ্ট। "বিরুদ্ধবাদী হওয়া শতগুণে ভাল, কিন্তু উদাসীন থাকা ভাল নয়," এই তাঁহার মত। আর কুৎসাপ্রচার কিম্বা বৈরসাধনই যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের প্রতিও তিনি অপ্রসন্ন নহেন। সংসারে প্রায়ই দেখা যায় একজন বড় হইলেই অন্যের গৌরব খর্ব্ব হয়। অতি অল্প সময়ে ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিপত্তি দেখিয়া কত স্বামী, পরমহংস, সাধু প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিরাও তাঁহাকে লোকের চক্ষে অশ্রদ্ধেয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে পত্রিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহারাই আবার কাছে আসিলে, তাঁহাকে স্তবস্তুতি প্রশংসাদি করিয়া থাকেন। ইহাদের অজ্ঞানতার জন্য তিনি অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) ক বিরুদ্ধবাদীর প্রতি প্রসন্ন ভাব।

পান এবং দুধ এ দুটিই তাঁহার অতি প্রিয় জিনিস—এ দুইটী জিনিসে মিশ্রিত করিয়া দুইবার তাঁহার উপর বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে—তিনি ছয়মাস কাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন—দেহ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এমন ঘৃণিত জীবও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই—এবং এপর্য্যন্ত কেহ ঘুণাক্ষরেও এ সমস্ত কথা জানিতে পারে নাই।

(৪) অসীম ক্ষমাশীলতা।

তাঁহাকে জাতিগত বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। উচ্চ শ্রেণীর বহুলোক

তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন; সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণীর লোকদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, কিছুদিন হইতে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহাদের মধ্যে প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ গঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। স্ত্রীজাতির অধঃপতিত অবস্থা দেখিয়া কতদিন অশ্রুপাত করিয়াছেন। কয়েকটী ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী মহিলাকে স্বহস্তে গঠিত করিয়া যাইতেও প্রয়াস পাইতেছেন।

(৫) অসাম্প্রদায়িকতা।

সকলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া যাহাতে জগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে, ইহাই তাঁহার শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে সাধনার দুইটীমাত্র প্রণালী আছে—ভগবানের নামকীর্ত্তন এবং জীবসেবা। সেবা—শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ভগবানে যাহাদের বিশ্বাস নাই, কিম্বা নামে অনুরাগ নাই জীবসেবাই তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট পন্থা। একটী শিষ্যের নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন—

(৬) জীবসেবা ত্যাগ।

"মায়া পরিত্যাগ করিয়া দয়া রাখিতে হইবে—বন্ধু বান্ধবের জন্য কার্য্য করা মায়া,—জগতের জন্য কার্য্য করা দয়া।"

শিষ্যদের মধ্যে যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়া ব্যস্ত তিনি তাহাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অনেক সময় বলিয়াছেন—

"আমরা জগতের কার্য্য করিবার জন্য আসিয়াছি—আমরা কি নিজের সুখ নিয়া ব্যস্ত থাকিব ?"

কখনও বা বলিয়াছেন—

"আমাদের কি একজন মা?—সমস্ত জগৎই যে আমাদের মা।"

তাঁহার প্রেমময় শিক্ষার প্রভাবে অরুণাচল হইতে ব্যক্তিগত চিন্তা, এমন কি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাব ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে।

(৭) পাশ্চাত্য সাম্যবাদীদের সহিত সহানুভূতি সত্ত্বেও প্রণালীতে পার্থক্য।

পাশ্চাত্য সাম্যবাদীদের সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে। কিন্তু ইহারা বিপথে চলিয়াছেন। রক্তপাতের দ্বারা জগতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না—ধর্ম্মের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা হইবে। এমন যথার্থ শক্তিমান পুরুষ একাকী সমস্ত জগৎকে কাঁপাইয়া তুলিতে পারে। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান একজন পুরুষেরও গতিরোধ করিতে পারে জগতে কার সাধ্য আছে? সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্মবলে বলীয়ান না হইলে সংস্কারের পথ চিরদিন কণ্টকিত থাকিবে ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

(৮) প্রেমের দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইবে—সংকীর্ত্তনের প্রভাব।

অরুণাচল সত্যের নিশান, প্রেমের নিশান নিয়া জগতের কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঠাকুর কোন সম্প্রদায়কেই সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন। তিনি সমগ্র দেশে যে বিপুল সংকীর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভাসিয়া যাইতেছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রেমে আলিঙ্গন করিতেছেন। উন্নত মুসলমান ফকীর হিন্দুভ্রাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া

"প্রাণগৌর নিত্যানন্দ" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গিয়াছে।

কোনও ধর্ম্মবিপ্লবের প্রাক্কালে সর্ব্বদাই একটা ভাব-স্রোত আসে। এইরূপ একটা ভাব-স্রোতের প্রচণ্ড অভিঘাতে সংকীর্ণতার জীর্ণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, জগতের সমস্ত জাতি প্রেমের এক মহোৎসবে যোগদান করিবে তিনি বহু দিন হইতে এই শুভবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—

(৯) তাঁহার শুভ-বার্ত্তা—অদুর ভবিষ্যতের আশা।

"আমি চোখে চোখে দেখিতেছি একমাত্র উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি হইবে, সমগ্র জগতে অচিরেই এক মহাভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে; গঙ্গার তীরে তারে হিমালয়ের শিখরে শিখরে আবার ঋষিদের আশ্রম বসিবে, ঘরে ঘরে মহাপ্রভাবা নারীকুল জন্মিবেন, মানুষের মধ্যে আবার মহাশক্তি জাগ্রত হইবে!"

আর এত বড় পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবিত কালের মধ্যেই সংসাধিত হইবে! কতবার কাঁদিয়া বলিয়াছেন,—

"আমার প্রাণের ভিতর দিয়া তুফান বহিয়া যাইতেছে, বুক জ্বলিয়া যাইতেছে। প্রাণের কথা কাহাকে বলিব? কে বুঝিবে, কে বুঝাইবে?

নানা বিচিত্র ভাবের সমাবেশে তাঁহার চরিত্রে একটী অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি একাধারে জ্ঞানী, কর্ম্মী, মহাযোগী,

তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ, প্রেমিকশিরোমণি। জ্ঞানরাজ্যের বড় বড় কথা তিনি সহজ সুন্দর যুক্তির সাহায্যে বুঝাইয়া দিতেছেন; শঙ্কর কিম্বা হেগেলের ন্যায় প্রগাঢ় দার্শনিক যে সমস্ত চরম সত্যে উপনীত হইয়াছেন—সমস্ত তাঁহার স্বতঃসিদ্ধের মত মনে হইতেছে; এবং তাঁহাদের মতামতে যেখানে অপূর্ণতা কিম্বা অসঙ্গতি তাহও অনায়াসে দেখাইয়া যাইতেছেন; এক একটা নূতন চিন্তা বিদ্যুৎশিখার চমকে সমগ্র জ্ঞানরাজ্যকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে। তিনি জগতের সমস্ত জ্ঞানকে একমাত্র ব্যাপক চিন্তার অন্তর্ভূক্ত করিয়া একটী অতি বিস্তৃত সমন্বয়দর্শনের ভিত্তিস্থাপন করিয়া যাইতেছেন। সময়ান্তরে স্বতন্ত্র গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। তিনি এমন সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যাহাতে, জগতের চিন্তায় বিপ্লব ঘটিয়া যায়। অথচ জ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি যে কেবল একটা মানসিক ব্যায়ামের জন্য নহে, জীবনেও প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন, তাহারও দৃষ্টান্ত নিজ জীবনেই দেখাইয়া যাইতেছেন।

(১) প্রগাঢ় জ্ঞান।

যাহারা সর্ব্বদা জ্ঞানানুশীলনে রত কিম্বা অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ তাহারা প্রায়ই কর্ম্মজগতে নেতৃত্বের অযোগ্য হইয়া পড়েন, কিন্তু তিনি সে শ্রেণীর লোক নহেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, বিধাতা স্বহস্তে নেতৃত্বের তিলক ললাটে অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এমন কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই যাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েও প্রখর দৃষ্টি দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। তাঁহার ভক্তদের মধ্যে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ গৃহী, কেহ উদাসীন ফকীর,

(২) কর্ম্মজগতে সহজ নেতৃত্ব।

কেহ যোগী, কেহ বৈদান্তিক, কেহ ভাবপ্রধান, কেহ সৌন্দর্য্যের উপাসক, কেহ প্রত্যেক বিষয়ই কবির চক্ষে দেখে, কেহ অদ্বৈতবাদের অতি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চাহিতেছে, কেহ প্রেম ছাড়া কিছুই বুঝে না, কেহ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, কঠোর সাধনা করিয়াছে, কেহ নিয়মিত সাধনা একদিনও করে নাই, এমন লোক আছে যারা সমস্ত জগৎসমস্যা নিয়া নিরন্তর চিন্তা করিতেছে, জড় ও চৈতন্যের ভেদ উঠাইয়া দিয়া বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সমন্বয় করিতে চাহিতেছে, আবার এমন লোক আছে যারা কর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই বুঝে না—আশ্রমটি যাদের চক্ষে একটী গৃহস্থ পরিবারের চেয়ে বড় বেশী কিছু নয়, এমন লোক আছে যারা বলিতেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উঠিয়া যাউক, আমরা নিজের জন্য কিছু চাহি না, জগতের কল্যাণ হউক, আবার অন্যে বলিতেছে ব্রহ্মদর্শন না করিলে আমার প্রাণের পিপাসা কিছুতেই মিটিতেছে না ; ঠাকুরের প্রতি কাহারও অটল বিশ্বাস, আশ্রমের কাজের জন্য সর্ব্বস্ব এমন কি স্ত্রীপুত্র পরিজনকে পরিত্যাগ করাও তাহার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র কথা, আবার এমন লোকও একটী আছে যে মিনিটে মিনিটে সন্দেহ করিতেছে ঠাকুর এবং আশ্রম-বাসী সকলে কেবল তাহারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

(ক) অরুণাচলে কর্ম্মীদের মধ্যে ভাববৈচিত্র্য।

কিন্তু এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রী পুরুষকে একমাত্র শক্তি সংহত করিয়া রাখিয়াছে। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার অনুসরণ করিতেছে এবং কেবল চিন্তার গভীরতায় নহে, জীবনের পূর্ণতায় প্রত্যেকে তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই, বক্তৃতা, উপদেশ কিম্বা বিধি বিধানের ছড়াছড়ি নাই, একমাত্র মস্তিষ্ক ইঙ্গিতে হেলায় খেলায় সকলকে

(খ) সর্ব্বভাবের লোককে সংহত ও পরিচালিত করিবার শক্তি।

পরিচালিত করিতেছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করিয়া, প্রতিজনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়া, তিনি সকলকে একটী বৃহৎ পরিবারে, একটী প্রেমশাসিত সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেছে তাহার জীবনের স্রোত ফিরিয়া যাইতেছে—আত্মা প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চ চিন্তা, সৌভ্রাত্র, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা মজ্জাগত হইয়া যাইতেছে; লোকলজ্জা, অভিমান, ব্যক্তিগত চিন্তা, বিষয়াসক্তি খসিয়া পড়িতেছে। মদের বোতল শিয়রে না থাকিলে রাত্রে যাহার নিদ্রা হইত না, সে আজ নামের নেশায় পাগল হইয়া উঠিতেছে, জীবসেবায় প্রাণ মন ঢলিয়া দিতেছে। সকলের মধ্যে এমন একটী সাধারণ জীবন ফুটিয়া উঠিতেছে—দেখিলে মনে হয় সকলে একই বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে কার্য্য করিয়া যাইতেছে।

প্রায় প্রত্যেকেই মনে করে ঠাকুর তাহাকেই সব চেয়ে বেশী ভাল বাসেন। তিনি প্রত্যেকের গুণের ভাগটুকু দেখিতেছেন, প্রত্যেকের অবস্থার মধ্যে নিজেকে ফেলিতে পারিতেছেন, প্রত্যেকের দুর্ব্বলতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি অথচ প্রত্যেকের ত্রুটি কিম্বা দুর্ব্বলতার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য আছে। সকলে জানে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। প্রথমে প্রাণে একটী আবেগ সৃষ্টি করিয়া বিচ্ছেদ, বিরহ এবং নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া হৃদয়ে বল দিতেছেন, আবেগকে স্থায়ী ভাবে পরিণত করিতেছেন; সন্দেহ কিম্বা অবিশ্বাস আসিলে এমন ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন যাহাতে সে ভাব গাঢ়তর হয়; কিন্তু নিজের কিছুতেই ভাবান্তর হইতেছে না। অবসাদের সময় আশ্বাস বাক্যে

উৎসাহ দিতেছেন; যখন ডুবিয়া যাইতেছে তখন হাতে ধরিয়া তুলিতেছেন কিন্তু অভিমানের ছায়ার ছায়াও মনে আসিলে তাহা একেবারে চূর্ণ করিয়া দিতেছেন। যদি কাহারও মধ্যে কোনও প্রকার দুর্ব্বলতা কিম্বা পাপচিন্তা লক্ষ্য করেন তবে, গুরুতর অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকিলে, সেই সময় কিছু না বলিয়া তাহাকে এমন অবস্থার মধ্যে ফেলিতেছেন যে কোনও কার্য্যে তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়—তখন এমন তীব্রভাবে শাসন করেন যে চিরদিনের জন্য তাহার হৃদয় শোধিত হইয়া যায়। ভিতরের রোগ বাহিরে প্রকাশ করিয়া চিকিৎসা করাই সুচিকিৎসকের কার্য্য।

(গ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

কে কোন কথা বলিতেছে, কে অযোগ্যভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, কে কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতেছে, কে অপরাধ করিয়া গোপন করিতেছে এমন কি কেহ আত্মীয় স্বজনের চিঠি পত্রের জবাব দিতেছে কি না, নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসগুলির প্রতি অযত্ন করিতেছে কি না, কাহারও খাওয়া পরার কোনও অসচ্ছন্দতা হইতেছে, কেহ শীতে কষ্ট পাইতেছে কিনা, অসুখের সময় রীতিমত ঔষধ ব্যবহার করিতেছে কি না; প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে, প্রত্যেক বিষয় তাঁহার নিকট নখদর্পণের মত ভাসিতেছে।

(ঘ) অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা—লোকমতে উপেক্ষা। তোষামোদে একান্ত বিতৃষ্ণা।

কর্ত্তব্যের খাতিরে যাহা করা প্রয়োজন নির্ভয়ে করিয়া যাইতেছেন—কে ভাল বলে, কে মন্দ বলে সে চিন্তায়—অণুমাত্রও বিচলিত নহেন। এখানে বিদ্যা, পদ, বংশ কিম্বা বয়সে কিছু হইবার নয়, মনুষ্যত্বের হিসাবে মর্য্যাদা। কাহারও ত্রুটী দেখিলে শিক্ষা, পদমর্য্যাদা প্রভৃতির

দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া তীব্রভাবে শাসন করিতেছেন; যে সংসারে তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না তাহাকেও পদে পদে সাবধান করিয়া দিতেছেন। একটী ছেলে আশ্রমের কার্য্যে অবহেলা করিয়া কেবল তাঁহারই সেবা করিতে চাহিত—তাহাকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে ভীত নহেন। কতবার বলিয়াছেন—

"তোমরা কেউ মনে করিও না—তোষামোদ করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। কর্ত্তব্য করিয়া যাও, জগতের কার্য্য করিয়া যাও—আমার প্রতি বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কিছুই আসে যায় না।···কর্ত্তব্য করিতে গেলে কত বিপদ আসে, কত নিগ্রহ নির্য্যাতন আসে; কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তা মনে স্থান দিলে চলিবে না। গুরুজন যদি পায়ে পড়িয়া কাঁদেন, তবু আমি কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইব না।"

আমাদের আসার পর হইতেই আশ্রমের প্রতি পুলিসের বিষদৃষ্টি পতিত হয়—একজন পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহাকে বলিয়াছিল "ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেই কোনও বিপদ থাকিবে না।" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন "কখনই না—আমি কখনই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিব না—আপনাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন" তিনি লোকমতের প্রতি পদে পদে উপেক্ষা দেখাইয়া আসিয়াছেন। দেশশুদ্ধ সকলের অপ্রীতিভাজন হইতে হইবে জানিয়াও তিনি স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমেই বলিয়াছিলেন—

"ইহারা ভ্রান্তপথে চলিয়াছে—একেবারে গোড়ায় না গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়া একটা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে। ধর্ম্মকে জাগ্রত না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। যিনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান, তিনি চিরস্বাধীন —মানুষের আত্মা যদি স্বাধীন না হয়, তবে পদে পদে দুর্ব্বলতা আসিবে, আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে।"

লোকমতে উপেক্ষা দেখাইতে যেমন প্রস্তুত আছেন তেমনি সত্যের নিকট মাথা নোওয়াইবারও সাহস আছে। একজন শিষ্য যদি ভ্রান্তি দেখাইয়া দেয় তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিয়া নিতেছেন।

(ঙ) লোকচরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

লোকচরিত্রে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি—কে কোন বিভাগে কতদূর উন্নতি করিতে পারিবে, কাহার দ্বারা কোন কাজ হইবে, কাহার উপর কতটুকু নির্ভর করা যাইতে পারে, কাহার জন্ম কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে; সামান্য আলাপেই বুঝিতে পারেন; কোন মুহূর্ত্তে কোন কাজটী আরম্ভ করিতে হইবে, কোন সময়ে কোন কথাটী বলিলে ক্রিয়া হইবে, কোন সময়ে কাজের সম্বন্ধে কতটুকু প্রকাশ করিতে হইবে; বহুপূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখেন। যাহার দ্বারা যে কার্য্য হইবে দুএক বৎসর পুর্ব্বেই তাহাকে গল্প কিম্বা পরিহাসচ্ছলে ইঙ্গিত দিয়া রাখেন; এবং তাহাকে এমনভাবে গঠিত করিয়া তুলেন যেন কার্য্যকালে তাহার নির্ব্বাচনই সকলের অভিমত

হয়। তীর্থযাত্রার একবৎসর পূর্ব্বেই মুনীন্দ্রনাথ বেনার্জ্জিকে (বিমলানন্দ) বলিয়া রাখিয়াছিলেন "তীর্থযাত্রার সময় তুই সঙ্গে থাকিবি।" বিমলানন্দ কথাটী ভুলিয়া গিয়াছিলেন—আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক এই সময়ে নিজ প্রয়োজনেই তাহাকে এক বৎসরের ছুটী নিতে হইয়াছিল এবং তিনিই সঙ্গে গিয়াছিলেন। স্বামী চিদানন্দ এক সময় বলিয়াছিলেন "আমাকে এমন শক্তি দিন যেন আপনার কথা জগতের নিকট প্রচার করিতে পারি"—ঠাকুর তখনই বলেন, "তোমার একার্য্য নয়—তুমি যাহাতে লোককে সাধনপ্রণালী দিতে পার—এমনভাবে তোমাকে শিক্ষা দিব।" ছ'বৎসর পরে আশ্রমের একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা প্রয়োজন হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে চিদানন্দই একার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

(চ) অবস্থাভিজ্ঞতা —দুরদর্শিতা।

ক্ষণিক আবেগ কিম্বা উত্তেজনার বশে অসময়ে কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার স্বভাব নহে। অসময়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কেহ অধীরতা প্রকাশ করিলে, প্রায়ই মুখে কিছু না বলিয়া কার্য্যের দ্বারাই বিড়ম্বিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সকলে কতটুকু স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত, বিবেচনা করিয়া কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে এমন স্বাভাবিক ভাবে, সহজ ক্রমবিকাশে বড় বড় কার্য্যের সূত্রপাৎ হইয়া যায়, সমস্ত এমন একটা খেলাধূলার মধ্য দিয়া আসে, যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। অনেক সময় গল্পচ্ছলে অন্য কাহারও মুখ দিয়া প্রস্তাবটী বাহির করিয়া ফেলেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বড় বড় কল্পনা জল্পনা তাঁহার মুখে কদাচিৎ শুনা যায়। একদিন আমাদের দুজনকে বলিয়াছিলেন—

"তোদের দুজনকে একটা কথা বলি। প্রথমেই বড় বড় কথা বলিয়া আরম্ভ করিস্ না। ছোট কথা হইতে স্বাভাবিকভাবে যখন বড় কথা আসিয়া পড়িবে, তখন বড় সুখবোধ হইবে।"

ছয় সাতটী ভক্তকে নিয়া আশ্রম স্থাপনের কল্পনা হয়, কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া ভিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল, একস্থানে উৎসবে নিমন্ত্রিত হওয়ায়, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে প্রচার কার্য্যের সূচনা হয়, ইহারই সহজ ক্রমবিকাশে দেশের নানা স্থানে প্রচারক-দল প্রেরণ করা স্থির হইল। মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন একটা খেলার ছলে স্বামী হংসানন্দ ও স্বামী চিদানন্দের অধীনে দুইটী সংকীর্ত্তনের দল গঠন করা হয়। চরিত্রানুযায়ী প্রত্যেকের বেশভূষা হইলে ভাল হয়, গল্পচ্ছলে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সহজে প্রত্যেকের কার্য্যবিভাগ ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের সূচনা করা হইল। গল্পচ্ছলে আশ্রমের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন স্থির হয়—একান্ত স্বাভাবিকভাবে ইহা বিস্তৃত আকার ধারণ করিতেছে।

(ছ) লোকচিত্ত আকর্ষণের শক্তি।

তাঁহার লোকচিত্ত আকর্ষণের শক্তি অসাধারণ। তাঁহার চরিত্র, তাঁহার কথাবার্ত্তা এমন অমৃতমাখা যে, কেহ একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে সহজে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে না। কোলের শিশু হইতে বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার প্রতি সমান অনুরক্ত। তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিত বলিয়া কিশোরগঞ্জে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালককে ৫০টী বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। বালকটী তবু তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই।—

একখানি পত্রে লিখিয়াছিল, "ঠাকুর, পঞ্চাশটী বেত্রাঘাতও কি যথেষ্ট হয় নাই ?"

তাঁহাকে ছাড়িয়া বাড়ী যাইতে হইলে শিষ্যদের মধ্যে অনেকে কাঁদিয়া আকুল হয়—অনেকে তাঁহার আদেশে বাধ্য হইয়া বাড়ী যায়। ভজনানন্দ একবার তাঁহার সঙ্গে হবিগঞ্জে যান। তিনি একটী সদ্যপ্রসূত শিশুকে বাসায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর তাহাকে বাসায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তিমি কাঁদিয়াই আকুল। আমরা তো দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া রহিলাম। তিনি যদি দু দিনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া যান, তখন সকলের আনন্দস্রোতে ভাটা পড়িয়া যায়—যদুপতি বিহনে বৃন্দাবনের যে অবস্থা, ভক্তদেরও তখন সেই অবস্থা।

(৯) লোকের হৃদয়ের উপর প্রভাব।

তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য প্রত্যেক ভক্তকেই অল্প বিস্তর নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন, অনেক স্থলে আত্মীয়বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইয়াছে—সকলে অম্লানবদনে তাহা সহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য অনেকে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে দারিদ্র্য মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। দুটি ভক্ত গবর্ণমেণ্টের আদেশ সত্ত্বেও তাঁহার সংশ্রব ত্যাগ করেন নাই। বিমলানন্দের মাতা ঠাকুরের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন; ভক্তিপথের বিরোধী বলিয়া তিনি জননী হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত বিমলানন্দ, জননীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করেন নাই। রমানন্দ নামক একটী যুবক ভক্ত আশ্রমবাসী হওয়ার পর বাড়ী গেলে, পিতামাতা তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। সে বলিল "আমি

কেবল আপনাদের পদধূলি চাই, এই পাইলে আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।” কিন্তু পিতামাতা যখন ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া, ঠাকুরের নিন্দা আরম্ভ করিলেন তখন বলিয়াছিল, “ঠাকুরের নিন্দা করিয়া আপনারা অপরাধী হইলেন, যতদিন না তাঁহার নিকট করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিবেন, ততদিন আর আমি আপনাদের নিকট আসিব না।” এর পর পিতামাতার বহু চেষ্টায়ও সে আর বাড়ী যায় নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক সময় তাঁহাকে কঠোর শাসন করিতে হয়, কিন্তু সকলে জানে ঠাকুরের অন্তরে কাহারও প্রতি রাগ থাকা অসম্ভব। কাহাকেও যদি আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেন তবু সে মনে করে আমার মঙ্গলের জন্যই এইরূপ করিলেন। আর সে ইহাও জানে—উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে ঠাকুর নিজেই আবার তাহাকে ডাকিবেন। কাহারও প্রতি বিশেষ কঠোরতা দেখিলেই প্রত্যাশা করা যায় সত্বরই সে বিশেষ কৃপা লাভ করিবে। ঢাকা-নিবাসী একটী অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক তৃতীয় উৎসবের সময় ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া হইতে শিলচার পর্য্যন্ত (প্রায় ২০০ মাইল) হাঁটিয়া আসিয়াছিল। একজন তাহাকে রেল ভাড়া দিতে চাহিলে বলিয়াছিল “দেবতা-দর্শনে যাইতেছি—হাটিয়াই যাইব—গাড়ীতে উঠিব না।” উৎসবান্তে ঠাকুর তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন—তাহার প্রতি নিতান্ত উপেক্ষার ভাব দেখাইলেন। যুবক তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল—তখন হইতেই সে তাঁহাকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়াছে—ঠাকুরের কথা শুনিলেই তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে।

তাহার প্রতি ঠাকুরের এ ব্যবহারে অনেকেই মর্ম্মাহত হইলেন—কেহ কেহ তাহার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর তাহাকে মৌলবী-বাজার পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকিবার অনুমতি দিলেন। উত্তরসুর হইতেই আবার ফিরিয়া যাইবার আদেশ হইল। ঠাকুরের দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া আর কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিলেন না—তিনি তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "তোরা কি তা'কে আমার চেয়ে অধিক ভালবাসিস? তার জন্য যাহা ভাল বিবেচনা হইয়াছে তাহাই করিয়াছি।" যুবক বিষণ্ণমুখে বিদায় হইল। কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাহার কিছু মাত্র ভাবান্তর হয় নাই। একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি ইহার মধ্যে এমন কি দেখিলে? কি দেখিয়া ইহার প্রতি এত অনুরক্ত হইলে?" যুবক উত্তর দিয়াছিল "কেন ভালবাসি—জানি না, কিন্তু একবার যে হৃদয় তাঁহাকে দিয়া ফেলিয়াছি সে হৃদয় আর ফিরাইয়া লইব কি প্রকারে?" চারি মাস পরে তাহার একটী বন্ধু এক পত্রে লিখিয়াছিল "বসু (রমেশচন্দ্র বসু) এখন একটা দেখ্‌বার জিনিষ হইয়াছে—তাহার চেহারায় অপার্থিব লাবণ্য ও মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার প্রেমে টলমল মুখমণ্ডল দেখিয়া শত শত লোক মুগ্ধ হইতেছে।" অকৃত্রিম অনুরাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য ঠাকুর অনেক সময় প্রিয় ভক্তদের উপরই অধিক কঠোরতা দেখাইয়া থাকেন।—এ শাসন প্রেমের শাসন—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—এ শাসনে অনুরাগ আরও বাড়িয়া যায়। শিশু মা'র খাইয়াও যেমন "মা" "মা" বলিয়াই কাঁদে, এখানকার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। সকলে উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করে—কেহ কোনও আদেশ পাইলে কৃতার্থ মনে করে, প্রাণে

অসীম বল অনুভব করে, আনন্দের সহিত আদেশ পালন করে—"ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন আর কথা কি? ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন আর চিন্তা কি?"

একদিন প্রণবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে কোনও ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন "ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাহারা তাঁহার আদেশে চিন্তামাত্র না করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারেন।" বলিয়াই চিন্তা হইল বড় শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, কথাটা কতদূর সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। একজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর যদি বলেন আপনি কি তাঁহার কথায় আগুনে ঝাঁপ দিতে পারেন?" সে ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া উত্তর দিল "হাঁ ঠাকুর বলিলে পারি বৈ কি?"—অনেকেরই উত্তর যে এইরূপ হইত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

৩. অপার প্রেম—শিষ্যদের সহিত মধুর সম্পর্ক।

গুরু শিষ্যে এমন মধুর সম্পর্ক জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি একাধারে গুরু, প্রাণসখা, স্নেহময়ী মাতা—তিনি নিজে কতবার বলিয়াছেন "আমিই তো তোদের মা।" অন্যের শিষ্যদের প্রতিও তাঁহার ঠিক একরূপ ব্যবহার—তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যান তাহাদের অন্য গুরু আছেন। তিনি কখনও কাহাকেও শিষ্য করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু একমাত্র প্রেমের আকর্ষণে শিষ্যদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক চিরজীবনের মত অচ্ছেদ্য হইয়া রহিয়াছে। এখানে সংকোচ নাই, সাংসারিক চিন্তা নাই, নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই—শিষ্যেরা অনেক সময় তাঁহাকে প্রণাম করিতেই ভুলিয়া যায়। তাঁহার নিকটে এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত অকাতর সহিষ্ণুতা পাইতেছে, যাহা বন্ধু বন্ধুর নিকট

পায় না, সন্তান যার নিকট প্রত্যাশা করে না। তিনি প্রত্যেকের জন্য যতটুকু চিন্তা করিতেছেন, কেহ নিজ শরীরের জন্য ততটুকু চিন্তা করে না—অনেকে একেবারেই চিন্তা করে না—তিনিই তো তাহার জন্য চিন্তা করিতেছেন; কাহার জন্য কি প্রয়োজন তিনিই ভাল বুঝেন। স্বামী চিদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন "আমার মা নাই, ভ্রাতা নাই, স্ত্রী নাই—আমি এসব কিছুই জানি না—আমি কেবল ঠাকুরকে জানি, এদেরে রাখা না রাখা তাঁর ইচ্ছা, সব তিনিই জানেন।" বাস্তবিকই তিনি জানেন। তিনি প্রত্যেকের পরিবারের ভাবনা ভাবিতেছেন, বাসার ঘর দরজার প্রতি পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি আছে। রোগ শোকে, চিকিৎসা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত তিনি করিতেছেন; এত বড় একটা পরিবারের বোঝা অকাতরে বহিতেছেন। অশ্বিনীর (সেবানন্দ) একবার জ্বর হইয়াছিল—তিনি তখন স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছিলেন। স্বামী চিদানন্দের সাধনের প্রথমাবস্থায় মৌনব্রত ভঙ্গ হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর কাঁদিয়াছিলেন। রাধিকা বাবু কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে গিয়াছেন— তিনি আর থাকিতে পারিতেছেন না—আমাদের কাছে বলিলেন "রাধিকা না থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না—চল একবার আশ্রমে গিয়া আসি।" তাঁহারা কিশোরগঞ্জে নামপ্রচারে গিয়াছেন—আমি নিরূপিত দিনে যাইতে পারি নাই। তাঁহারা এত আনন্দ পাইতেছেন, আমি সে আনন্দের ভাগ পাইলাম না; ঠাকুর এ কথা ভাবিয়াই বিমর্ষ; বনগ্রামে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে আমাকে গাঢ়-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন—আকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "তুই এত দেরী করিলে কেনরে মহেন্দ্র!—যে ভাবে দিন যাইতেছে রে মুখের কথায় বুঝাইবার নয়—তুই কোথায়

ছিলিরে ?”..............আমার দ্বারা জগতের কোনও কাজ হইল না রে। আমার দ্বারা যদি কাজই না হইবে তবে তোরা আমাকে সংসারে আনিয়াছিলি কেন রে ?” ইত্যাদি”। সময় সময় এই স্নেহের উচ্ছ্বাস এত বাড়িয়া যায়—তাঁহার দেহে এমন মমতামাখা মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, যে কোনও কোনও আত্মবিস্মৃত শিষ্য তাঁহার কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে—বুক চুষিতে থাকে। ‘শ্রীশ্রীলীলামৃত গ্রন্থ’ হইতে একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিতেছি—“বিকাল বেলা অভয়ানন্দ অস্থির হইয়া আশ্রম হইতে আসিল—কি জানি কেন ঠাকুরকে দেখিবার জন্য সেদিন তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল—সে চারি মাইল পথ ছুটিয়া আসিয়া রাধিকার দেব-মন্দিরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইল—অমনি উন্মত্তবৎ একলম্ফে ঠাকুরের স্কন্ধে চড়িয়া বসিল, পরে ক্রোড়ে শায়িত হইয়া শিশুর মতন ঠাকুরের বুক চুষিতে লাগিল।”...কখনও কখনও এক দিবসের মধ্যেই বহুবার ঠাকুরের ভাব পরিবর্ত্তন হয়—সঙ্গে সঙ্গে রূপের অতি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়।

শারীরিক সৌন্দর্য্য।

‘শ্রীশ্রীলীলামৃতে’র গ্রন্থকার ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার এই মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া পৃথিবীতে ষড় ঋতুর আবির্ভাবের সহিত ইহার উপমা দিয়াছেন। সে বর্ণনাটী এই :—“ঠাকুরের দেহটী যেন পৃথিবীর মত—ষড়ঋতুর আবির্ভাবে পৃথিবীর ন্যায় সে দেহ কালে কালে বিচিত্র শোভা ধারণ করে।

কোনও সময়ে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-মরীচি-দীপ্ত গ্রীষ্মের মত রুদ্রভাব। কখনও বা মুখমণ্ডল বিষাদের জলদপটলে আঁধার হইয়া যায়, নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বর্ষিত হইতে থাকে—রোমরাজি বাল-কদম্ব-

পুষ্প-কেশরের মত স্ফুরিত হয়, তখন ঠাকুরের দেহরূপ পৃথিবীতে প্রাবৃটের আবির্ভাব। কখনও বদন পূর্ণেন্দু-প্রতিম সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে—নীলকেশ-শোভিত শিরোদেশ, নির্মেঘ নীলাকাশের মধুর নীলিমাকে পরাস্ত করে। স্বর—স্নিগ্ধ গম্ভীর, শরীরটী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কুমুদবনের মত কমনীয় হইয়া যায়—তখন শরৎকাল। কখনও বা সূক্ষ্ম-স্বেদ-কণিকা-সমাবৃত স্বর্ণকলেবর কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন পক্ক ধান্যক্ষেত্রের হৈমন্তিক সুষমাকে লাঞ্ছনা দেয়। কোনও সময়ে শীতের আড়ষ্ট ভাব। অঙ্গ শ্রীহীন—অধরে বাঁধুলি শুষ্ক—নেত্রে নীলোৎপল দীপ্তিশূন্য। আবার কখনও শ্রীঅঙ্গ, বাসন্তীরাণীর বিলাস-ভূমিতে পরিণত হয়; অধরে অশোক ফুটে, নয়নে রাতা উৎপল, গণ্ডে গোলাপ, করোরুহে চম্পকরাজি, দন্তে কুন্দ, চরণে স্থলারবিন্দ ফুটিয়া উঠে, কণ্ঠে কোকিল ডাকে—নিঃশ্বাসে মলয় ছুটে; তখন দেহরাজ্যে বসন্তের উদয়।"

শ্রীশ্রীলীলামৃতের গ্রন্থকার লিখিতেছেন:—"একদিন দ্বিপ্রহরান্তে ঠাকুরের এক অপূর্ব্ব ভাব আসিল। শয্যার পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে একখানা বড় আয়না টাঙ্গানো আছে; ঠাকুর আয়নার সাম্‌নে বসিয়া আছেন—ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত অঙ্গে একটা কমনীয় কোমলতা সঞ্চারিত হইল—অঙ্গে অঙ্গে অপার্থিব লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—আলুথালু কেশপাশ হেমবরণ পৃষ্ঠদেশে এলাইয়া পড়িয়াছে, মরি মরি কি মোহন মাধুরী! দর্পণমধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনে সেদিন ঠাকুর নিজেই মুগ্ধ হইলেন,—দুনয়নে অশ্রু ছুটিতে লাগিল—আকুল হইয়া 'মা' 'মা' ডাকিতে লাগিলেন—একা সে আনন্দ সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ মুনীন্দ্রকে (বিমলানন্দ) ডাকিলেন—মুনীন্দ্র আসিলে ভাবজড়িত কণ্ঠে বলিলেন 'কেমন খুব

অপূর্ব্ব বাসৎল্য-ভাব।

সুন্দর লাগেনা—খুব সুন্দর, কাঁদিলেও সুন্দর। দেখ্ তো এই চেহারা যদি তীর্থযাত্রার সময় মানুষ দেখিত, তবে কি হইত?' মুনীন্দ্র আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বলিল 'এই চেহারার সঙ্গে কি সে চেহারার তুলনা হয়!' ঠাকুর বলিলেন 'কি হইতেছে—যেমন ভিতরে একটা তুফান খেলিতেছে' তারপর আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন 'কেবল ভাবের দ্বারা বর্ণনা হয়—কথা দ্বারা হয় না; যদি তোদের কারো হয় তোরা মরিয়া যাইবে, পার্‌বে না সহ্য কর্‌তে!' এই কথা বলিয়া অতি বিষাদিত-মুখে মুনীন্দ্রের দিকে চাহিলেন—তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।......... কিছু পরে গিরীন্দ্রকে ডাকিলেন 'আয়রে গিরীন্দ্র এখানে আয়'—গিরীন্দ্র আসিলে, দুইজনকে দুই পাশে বসাইয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন 'দেখ্‌রে আমি দুই ইন্দ্রকে দুই দিকে লইয়া আছি'......পরে উপেন্দ্রকে ডাকিলেন, উপেন বাবু আসিলে কাশীশ্বর লালাকে ডাকিতে কহিলেন......লালা (ভবানন্দ) আসিলে বলিলেন 'আয় সমস্তে মিলিয়া এখানে বসিয়া থাকি' এই কথা বলিয়া দুইটী বাহুর বেষ্টনে সকলকে জড়াইয়া বসিয়া রহিলেন। একটী সুন্দর পাখীর ডানার ছায়ায় যেন শাবকগুলি বসিয়া আছে।.....চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল—মাতৃস্নেহে মুখখানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।"

সখ্যভাব।

আবার কখনও সখার মতন আচরণ করিতেছেন—তখন কথায় কথায় হাসি কৌতুকের ফোয়ারা ছুটাইতেছেন—হাসিতে হাসিতে কোনও শিষ্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন—দুইজন শিষ্যের মধ্যে ঝগড়া বাঁধাইয়া দিয়া তামাসা দেখিতেছেন।

কিন্তু চপলতা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—পরিহাসচ্ছলে পদে পদে শিক্ষা দিতেছেন—যাহার মধ্যে যে গলদটুকু্ আছে কিছুই গোপন রাখিতে পারিতেছে না। কখনও কখনও হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়াও তাঁহার প্রাণের গভীর আবেগ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রীলীলামৃত হইতে একটী ঘটনা মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"এই সময়ে যতীন্দ্র বর্দ্ধন (নিরঞ্জনানন্দ) আসিলেন। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া গিরীন্দ্রকে বলিলেন 'আর একটা ছেলে এসেছে, তাহার সঙ্গে একটু মজা করি' এই বলিয়া চকিতে উঠিয়া—যতীনকে গলায় জড়াইয়া ধরিলেন। গাহিতে লাগিলেন—'বাঁশী বাঁজত—রাধানামের সাধা বাঁশী একবার বাঁজত······।' পরে গিরীন্দ্রকে এক বাহুতে ও যতীন্দ্রকে অপর বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া ভাবাবেশে গাহিতে লাগিলেন 'গদাধর গোরার মরম জানে—সময় বুঝে দাঁড়ায় বামে—গদাধর গোরার মরম জানে।' পরে বলিলেন 'প্রেম কি যার তার সঙ্গে হয়—প্রেমের যে কণিকামাত্র আস্বাদ পায় নাই—সে কি করিয়া প্রেম দিবে।'·· ···এই কথার পর যতীন সহসা চীৎকার করিয়া ঠাকুরকে লইয়া ভূতলে পতিত হইল। ঠাকুর চিৎ হইয়া পড়িলেন—যতীন বক্ষোপরি, পরে ঠাকুর যতীনকে বুকে রাখিয়া শুইয়া রহিলেন—সায়াহ্ন পবনে উভয়ের তপ্ত শ্বাস মিশিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে রহিলেন—যতীন একটী হাতে ঠাকুরের পিঠ বুলাইতে লাগিল। অল্প পরে ঠাকুর উঠিয়া এক পা' যতীনের বুকে রাখিয়া গম্ভীররবে বলিলেন 'তারা ব্রহ্মময়ী মা—ক্লীঁ কৃষ্ণ দয়াময় হরি।' আবার গাহিলেন 'গদাধর গোরার মরম জানে—সে যে সময় বুঝে দাঁড়ায় বামে—গদাধর গোরার মরম জানে।········"

ঠাকুর ভক্তদের কত মান, অভিমান, কত আব্দার সহ্য করিয়া থাকেন ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের লিখিত বিবরণী হইতে তাহার একটী অতি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাইবে:—

"......বোধ হইল তিনি যেন আর আগেকার ঠাকুর নন। স্বতন্ত্র একজন মানুষ; তখন তাঁহাকে স্বাভাবিক অপেক্ষা ও প্রশান্ত ও ধীর বোধ হইতেছিল। ঠাকুরকে নিয়া আমি কোথায় রাখিব, কি করিব কিছুই ঠিক পাইতেছি না। কখনও দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি— কখনও বা তাঁহার পায়ে পড়ি, কখনও তাঁর কাঁধের উপর চড়িয়া বসি, কখনও তাঁহার বুকের উপর লাফাইয়া পড়ি, কখনও তাঁহার পা টানিয়া আমার বুকের উপর রাখি। 'তোমার পা আমার বুকে রাখিতে পারি, আমার পা কি তোমার বুকে রাখিতে পারি না?' এই বলিয়া একবার আমার পা তাঁহার বুকে তুলিয়া দিলাম। তিনি হাসিতে লাগিলেন। একবার বলিলাম, 'আমার বুকের উপর তুমি দাঁড়াও'— ঠাকুর 'সোহহং' বলিয়া তাহাই করিলেন......একবার আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাঁহার কাঁধের উপর মাথা দিয়া কোলে ঝাপাইয়া পড়িলাম! ঠাকুরের পশ্চাদ্দিকে যুগলমূর্ত্তির ছবি; পড়িয়া গিয়াই তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম......একবার বলিলাম 'তুমি আমার উপর শয়ন কর'। আমি চিৎ হইয়া মাটীতে শয়ন করিলাম। ঠাকুর মুখের উপর মুখ, বুকের উপর বুক রাখিয়া নিরাপত্তিতে শয়ন করিলেন।"

প্রেমিকভাব।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ পদস্থ লোক। বয়সে প্রবীণ, ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য, আর যাহাকে নিয়া তিনি এইরূপ শিশুর মত

খেলা করিতেছেন—তিনি কে? এক বৎসরের মধ্যে যাহার কার্য্যে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যিনি সমগ্র জগতের ইতিহাসের স্রোত ফিরাইয়া যাইতে সাহস রাখেন; আর এও যাঁর কাছে একটা ছেলেখেলা মাত্র। কতটুকু প্রেমে মানুষ এত আত্ম-বিস্মৃত হইতে পারে? কতটুকু প্রেমে এমন মাথামাথি সম্ভবপর হয়?—আর একদিনের ঘটনা শুনুন:—"একদিন রাত্রি নয়টার সময় বৃষ্টি হইতেছিল, তবুও ঠাকুরের নিকট যাইবার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—শয়ন ঘরে আহারান্তে একটী চেয়ারে বসিয়াছিলাম—শরীরে ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। স্থির থাকিতে পারিলাম না......বৃষ্টির বাধা না মানিয়া তারাপুরে যাত্রা করিলাম।......গোপাল বাবুর বাড়ী গিয়া জানিলাম ঠাকুর অন্য ঘরে খাইতে বসিয়াছেন। আমি একখানা চেয়ারে বসিয়া সতৃষ্ণ ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার আর সহ্য হইতেছিল না—যতই তাঁহাব আসিতে বিলম্ব হইতেছিল ততই আকুলতা বাড়িতে লাগিল—আমার মনে হইতেছিল ঠাকুরই আমাকে পাগল করিয়া দৌড়াইয়া আনিয়াছেন......আমি যে আসিয়াছি তিনি জানিতে পারিয়াছেন তবু তিনি ইচ্ছা করিয়া এই বিলম্ব করিতেছেন ও আমার কষ্ট বাড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর ঘরে আসিয়া পান খাইতে লাগিলেন। আমি যে আসিয়াছি তাহা যেন তিনি জানেন না—আমার দিকে একবার চাহিলেনও না। তাঁহার এই উপেক্ষার ভাব দেখিয়া বড়ই রাগ ও দুঃখ হইল। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন 'কি ডাক্তার!

এই অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যে এত রাত্রে এখানে কেন?' কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল—মুখ ফুটিয়া উত্তর করিতে পারিলাম না—মনে মনে কহিলাম 'নিষ্ঠুর, নিজে টানিয়া আনিয়া এখন এমন কথা কহিতেছ।' শরীরে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়া আরম্ভ হইল। আমি উলট পালট খাইতে লাগিলাম।······

ঠাকুর আমার নিকট বসিয়া স্থির হইতে বলিলেন ও আমাকে পা দিয়া চাপিয়া ধরিলেন—কিন্তু ধরিতে দিলেম না—আমার অস্থিরতা বড়ই বাড়িয়া গেল। তিনি নীচে নামিয়া চৌকী হইতে পাঁচ ছয় হাত দূরে সরিয়া পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। আমি চৌকীর উপর হইতে এক লম্ফ দিয়া তাঁহার উপরে পতিত হইলাম। 'আমার শরীর আজ ভাল নয়, আজ এই রকম হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, তোমরা ইহাকে ধরিয়া রাখ' ঠাকুর গোপাল বাবু প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন।·········গোপাল বাবু প্রভৃতি আমাকে ধরিয়া রাখিলেন ও বলিলেন—'ঠাকুর কোথায় গেলেন আমরা জানি না, তিনি বলিয়া গিয়াছেন রাত্রি ৪টার সময় ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে আজ আর আপনার দেখা হইবে না, তাঁহার শরীর বড় ভাল নয়।' আমি ভাবিলাম ঠাকুর হয় ত সুরেন বাবুর বাসায় গিয়াছেন।······অমনি উঠিয়া সুরেন বসুর বাড়ীর দিকে দৌড়িলাম—তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তা কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল—কিন্তু আমি পাগলের ন্যায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রবলবেগে দৌড়িলাম।······

আমি সুরেন বসুর বাসায় আসিয়া মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম—ঠাকুরকে এই ঘরে পাইলাম না—তাঁহার জন্য প্রাণ ছটফট

করিতে লাগিল। অন্য ঘরে ঠাকুর আছেন কি না পূর্ণকে পাঠাইয়া অনুসন্ধান করা হইল—কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। কি যে করিব—কিছুই ঠিক পাইতেছিলাম না। তখন শুনিলাম নবাগত একটী যুবক গাহিতেছে—'মাঝ খানে ডুবিলে তরী কলঙ্ক তোমার' এই একটী গান গাহিয়া সুরেন বসুর বাসার দিকে আসিতেছে। 'কলঙ্ক তোমার' গানের কেবল এই দুইটী শব্দই কর্ণে প্রবেশ করিল। সে আমার সম্মুখে আসিলেই সে যে গান গাহিয়াছিল, আবার গাহিতে অনুরোধ করিলাম। ......সে গাহিল—

"অধীনীরে তীরে ধীরে কর পার,
আমরা গোপের নারী না জানি সাঁতার ;
তরী করে টলমল, প্রসারিতে উঠে জল ;
মাঝ খানে ডুবিলে তরী কলঙ্ক তোমার।"

গান শুনিয়া আমার অস্থিরতা শতগুণ বাড়িয়া গেল।......

ঠাকুরের উপর অভিমান হইল ; যার জন্য এত কষ্ট করিয়া আসিলাম—কিছু চাহিতে আসি নাই—শুধু একটু দেখিতে আসিয়াছিলাম—সে এই মত ব্যবহার করিল—পলাইয়া রহিল। রাত্রি ৪টার সময় আসিলে দেখা পাইব, গোপাল বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অভিমান হইল—ভাবিলাম 'না, এখন যখন দেখা পাইলাম না তখন আর ইহার কাছে আসিব না।' পূর্ণকে নিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।......

ঠিক ৪টার সময় জাগিয়া গেলাম, কিন্তু তারাপুর যাইতে আর ইচ্ছা হইল না। আর কোনও দিন—ঠাকুরের নিকট যাইব না এমন ভাবই তখন মনে হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে ঠাকুর গোবিন্দ বাবুর বাসায়

আসিয়া আমাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য আমার বাসায় লোক পাঠাইলেন—আমি ঠাকুরের নিকট যাইতে অস্বীকার করিলাম। লোকটী বলিল "তিনি অবশ্য অবশ্য আপনাকে একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছেন।" তখন আর অভিমানের জোর টিকিল না। গোবিন্দ বাবুর বাসায় গেলাম। ঠাকুর তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন—আমি যাইবামাত্র পড়িয়া গেলেন। চক্ষু হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বলিলেন 'সুরেন, উঠিয়া আয়, তোর পা দুখানা আমার বুকের উপর দে;' কথা শুনিয়া প্রাণ চমকিয়া উঠিল—বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। পায়ে বুট পরা, নিকটে যাইতে পারিলাম না, আমিও চৌকির একপ্রান্তে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। রাস্তার ধারে, গোবিন্দ বাবুর ঘর। আমি বলিলাম 'এখানে এই সব এই রকম হইতে থাকিলে লোকে কত কিছু বলিবে। আমার বড় লজ্জা করে'। ঠাকুর বলিলেন—'তোমার এখনও লজ্জা আছে—লজ্জার কারণ কি আছে? আমরা একটু খেলা করিতেছি মাত্র। তোমার লজ্জা হইবে বলিয়াই আমি তোমার বাসায় যাই নাই—না হইলে আমিই তোমার বাসায় যাইতাম। আমার কোনও লজ্জা নাই, তোমার জন্যই এখন এখানে আসিয়াছি। আমার শরীর খারাপ। রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা হইলে খুবই খারাপ হইত—তবু রাত্রে ২।৩ বার সমাধি হইয়াছে।' কথার ভিতর দিয়া কত প্রেম ও কাতরতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যেন আমার নিকট কত অপরাধী—রাত্রে দেখা না দিবার জন্য নিজ হইতেই কৈফিয়ৎ দিতেছেন!........."

এ প্রেমের তুলনা কোথায়? গুরু শিষ্যে এমন মধুর, এমন পবিত্র সম্পর্ক কাব্য উপন্যাসেও কি কেহ দেখিয়াছেন? এই কুহকেই তো শত শত লোকে স্ত্রী পুত্র ভুলিয়া যাইতেছে, কত মদ্যপ, গঞ্জিকা-সেবী, দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোক ভগবৎ-প্রেমিকে পরিণত হইয়াছে, ইহাতেই অঘটন সংঘটন হয়।

ভগবৎ প্রেমই তাঁহার জীবনরহস্য।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং" উপনিষদের এ উপদেশটী তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার জীবনতারটী এই এক সুরে বাজিতেছে। ভগবান অমৃতের খণি, জীবের জন্য তিনি হাত বাড়াইয়াই রাখিয়াছেন, ভ্রান্ত মানব কুপথে বিচরণ করিয়া তাঁর মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝে না, তাঁর প্রসারিত স্নেহহস্ত দেখে না। আকুল প্রাণে তাঁকে ডাক, তাঁর উপর নির্ভর কর, তাঁর কাছে সব নিবেদন কর; বাহ্য উপকরণে নয়, ভালবাসা দিয়া, চক্ষের জল জল দিয়া তাঁর পূজা কর—তাঁর অমৃতরাজ্যের অমৃত বাতাস গায়ে লাগিলে সংসার-শিকল আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে, ইহাই ঠাকুরের প্রধান শিক্ষা।

"শক্তি দেখিয়া ভুলিও না, শক্তি লাভ লক্ষ্য নয়। তাঁকে না পাইলে সাধন বিফল হইবে, তাঁকে পাইলে, শক্তি চরণে লুটাইবে। পদ্মরাগ মণি পাইলে, কাঁচ দিয়া তুমি কি করিবে?"—

ইহাই তাঁহার প্রাণের কথা, ইহাই তাঁহার জীবনরহস্য; এটি না বুঝিলে তাঁহার জীবন, তাঁহার চরিত্র বুঝা যায় না।

"তুই যে আমার মায়ের মতন মা' গাহিতে গাহিতে যখন তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যান—'গৌর আমার নয়নতারা, গৌর আমার প্রাণ গো' গাহিতে গাহিতে যখন চোখে অশ্রুধারা বহে, সে অবস্থায় না দেখিলে তাঁকে চিনা যায় না, তাঁহার চরিত্র বুঝা যায় না।

'মা আমারে দয়া করে শিশুর মত কবে রাখো', 'শিখায়ে দে তুই আমারে কেমন করে তোরে ডাকি—এক ডাকে ফুরায়ে দে রে জন্ম ভরার ডাকাডাকি' এইগুলি তাঁহার অতি প্রিয় গান।

মার ইচ্ছায় সব হইতেছে, তিনি সব করিতেছেন, তুমি আমি কেহ নই। 'আমি কিছু করিতে পারি' এ ভাবের কথা তাঁহার মুখে কদাচিৎ শুনা যায়। 'মা যদি দেন, মা যদি পূর্ণ করেন, মা কেন এটা করিলেন কি জানি, মা যখন এটা করিয়াছেন তখন ভাল হইবে, মার ইচ্ছা হইলে, অসম্ভব কি?" এই ভাবের কথা তাঁহার মুখে লাগিয়াই আছে। তাঁর অভিপ্রেত কার্য্যে কিছুরই অভাব হইবে না; এ বিশ্বাস এত দৃঢ় যে তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "তোমরা সকলে যদি চলিয়া যাও, আমি নিজে যদি না থাকি, তবু তাঁর কার্য্য কিছুতেই বন্ধ হইবে না।"

তাঁহার গভীর নির্ভরশীলতা।

শত ভাবে, শত ঘটনার মধ্য দিয়া এই কথাটী শিক্ষা দিতেছেন—আমাদের ছেলেরা পর্য্যন্ত এ কথার মর্ম্ম বুঝে—অরুণাচলের বল এই খানেই।

একজন শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন "তুমি নিজেকে এত দুর্ব্বল ভাব কেন? অনন্তশক্তির আধার হইয়া এরূপ ক্ষুদ্রভাবের পরিচায়ক কথা কেন? আমরা তাঁর সন্তান, তাঁর সন্তান সর্ব্বদাই

নির্ভরশীলতা তাঁহার প্রাণে অসীম বল দিয়াছে।

সবল এবং অসাধারণ কার্য্য করিতে সক্ষম। তিনি বিপদের মধ্য দিয়া লোকনিন্দার মধ্য দিয়া সন্তানকে গঠিত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁর সন্তান আমরা—আমাদের ভয় কি? আর সম্পদে কিংবা গৌরবেই বা অভিমান করিবার কি আছে?”

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন।—

“সাধারণ লোকের মত, ছেলেপেলের মত প্রশংসা শুনিলেই বক্ষস্ফীত এবং নিন্দা শুনিলেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে কেন? সব বিপদ সহ্য করিয়া আমি দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিয়া যাইতেছি—আমার দিকে তাকাইয়া ও তো মনকে প্রবোধ দিতে পার? আমরা তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইতেছি, আমাদের ভাল-মন্দ, বিপদ-সম্পদ কিসের? জগতে কোন মহাপুরুষ এই সব বিপদের হাত হইতে—বিরুদ্ধবাদীর ষড়যন্ত্র হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন? জগতে যিনি যত বড় কাজ করিয়াছেন তাঁহারই তত বড় বড় বিপদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। আমি কিছু-তেই ভয় করি না, সমগ্র জগতের লোক বিরুদ্ধে গেলেও ভয় করি না। মা বলিতেছেন—মা ভৈঃ”

পাকা খেলোয়াড় অনেক সময়ই ইচ্ছা করিয়া হার মানে। ভগবানের উপর কিরূপ নির্ভর করিতে হয় শিক্ষা দিবার জন্য ঠাকুর অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই বিপদকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ইহাই শিক্ষা দিবার

জন্য প্রত্যেক শিষ্যকে ইচ্ছা করিয়া শত পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়াছেন। কত ঘটনার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন। মানুষকে দিয়া কিছু মাত্র ভরসা নাই। যেখানে অধিক প্রত্যাশা করা গিয়াছে, সেখানে প্রায়ই কিছু হয় নাই, অথচ অপ্রত্যাশিতভাবে সর্ব্বদা সাহায্য আসিতেছে, কাজ কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। "শ্রীভগবানের উপর যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে তার আর নিজের জন্য চিন্তা করিতে হয় না—ভগবানকেই তার জন্য সব করিতে হয়"—এ যে একটা কথার কথা নয়, কত আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্য দিয়া ইহা দেখাইয়াছেন। কেউ পরিবার পরিজনের জন্য বেশী ব্যাকুল হইয়া পড়িলে বলিয়া থাকেন —"তুমি তাদের রক্ষা করিবার কে? তোমার নিজেকে রক্ষা করে কে?" কেউ অত্যধিক অহমিকা প্রকাশ করিলে প্রায়ই বলেন "তুমি বিক্রমপুরের কার মৌসা?" একজন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন "দয়া না পাইলে অগত্যা সাধনা দ্বারাই তাঁহাকে লাভের চেষ্টা করিবে লিখিয়াছ, শুনিয়া একটু হাসি পাইল। সাধনা যে করিবে তাহাই কি দয়া ভিন্ন করা যায়?… ………সর্ব্বদা মনে রাখিও মানুষ একটা যন্ত্রবিশেষ—তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত আমাদের এক পা'ও চলিবার ক্ষমতা নাই, "তোমার খেলা খেল তুমি, তোমার ইচ্ছা হউক পূরণ" এইটী ধুঁয়া করিয়া সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া সংকীর্ত্তন করিও।"

ভগবানে আত্ম-সমর্পণ।

এই একান্ত নির্ভরশীলতা তাঁহার প্রাণে অসীম বল দিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় করে নাই। আর আত্মপ্রতারণায় প্রশ্রয় দেওয়া ও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। প্রণবানন্দের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

নির্ভরশীলতা নিষ্ক্রিয়তা নহে।

"মুখে 'তোমার ইচ্ছা হউক পূরণ' বলিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিলে কিম্বা অধীরতা প্রকাশ করিলে চলিবে কেন? তোমার জীবনে যদি কোন ও কার্য্য থাকে তবে মা আপনি শক্তি দিবেন—সময় উপস্থিত হইলে তিনিই ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া চাওয়াইয়া লইবেন। কিন্তু অধীরতা আর ব্যাকুলতা এক কথা নয়। অধীরতার অর্থ—ভগবানের মঙ্গল অভি-প্রায়ে অবিশ্বাস। তাঁহার ইচ্ছাকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে শিখ, তিনিই মনের বাসনা পূর্ণ করিবেন।"

বহু পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—প্রত্যেকে শয্যাপার্শ্বে পাঁচটী কথা লিখিয়া রাখিও—মাথার উপরে "হরি বল," শিয়রে "কোনও কর্ম্ম করিব বলিয়া রাখিয়া দিও না," বামদিকে "আলস্য করিও না" ডানদিকে "নিজের আত্মায় বিশ্বাস কর" পায়ের দিকে "প্রত্যেক মানুষ অসাধারণ কার্য্য করিতে সক্ষম।"

সত্যের কাছে কল্পনা মলিন হইয়া যায়, চরিত্রমাধুর্য্যে—ভাব গাম্ভীর্য্যে চপল সমালোচনা স্তব্ধ হইয়া যায়।

ইনি উপন্যাসের নায়ক নহেন—কল্পনার রেখাপাত কিম্বা ইতিহাসের কুজ্ঝটিকা এ চরিত্রকে মহীয়ান করিয়া তুলে নাই। ইনি ত্রিংশৎবর্ষীয় একজন নবীন যুবক—সমগ্র জীবন তাঁহার সম্মুখে। কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়া দেখ, গভীরতার দিক দিয়া দেখ, ব্যাপকতার দিক দিয়া দেখ—

অবতরণিকা।

গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় চিন্তা, প্রশস্ত হৃদয়, বিরাট আকাঙ্ক্ষা, মহতী কল্পনা, অগাধ বিশ্বাস, অসীম সাহসিকতা, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বতোমুখী প্রতিভা, মনোহর রূপ, অপার অতলস্পর্শ প্রেম, সর্ব্বগুণের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ, সর্ব্বভাবের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, কয়টি ঐতিহাসিক চরিত্রে হইয়াছে ?

ঠাকুর দয়ানন্দ।

জন্ম ও পরিবার।

১২৮৮ বাঙ্গালার ৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বামৈ গ্রামের সম্ভ্রান্ত চৌধুরী-বংশে ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে বহু সাধক ও সিদ্ধপুরুষের জন্ম হইয়াছে। পিতামহ হরচরণ চৌধুরী একজন সাধকপুরুষ ছিলেন। তিনি এক সময়ে দুইটী পুত্রের বিয়োগে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলে আরাধ্যা দেবী ভগবতীর বরে দুইটী পুত্রসন্তান লাভ করেন; (ঠাকুরের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চৌধুরী) জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গুরুচরণ চৌধুরী মহাশয় হবিগঞ্জের একজন প্রধান মোক্তার। ইনিই ঠাকুরের পিতা। লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও আত্মসম্মানবোধের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। স্বহস্তে সকলকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে তাঁহার পরম আনন্দ। খুল্লতাত অভয়াচরণ চৌধুরী মহাশয় একজন সুকবি। তাঁহার রচিত কয়েকটী গান ঠাকুরের বিশেষ প্রিয়। "এস গৌরাঙ্গ নদীয়ার চাঁদ হে" এবং "ধন্য রামকৃষ্ণ ধন্য" এই দুটি গান এখন দেশবিখ্যাত।

পরিবারের সকলেই দীর্ঘকায়, সুস্থদেহ, সুরসিক, সঙ্গীতপ্রিয় ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। অতিথির প্রতি সৌজন্য এই পরিবারের একটী বিশেষত্ব।

দলপতি ছিলেন। তাঁহার জীবন-নাটকের এই অঙ্কটি নিবিড় রহস্য-জালে সমাবৃত। এক দিন যবনিকা ভেদ করিয়া ইহার উপর আলোক পতিত হইলে অতি অদ্ভুত ঘটনানিচয় প্রকাশিত হইবে; তখন লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না। এই সময়েও তাঁহার চরিত্রে কয়েকটী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। তিনি কখনও সত্য গোপন করিয়া লোকের নিকট সুনাম পাইবার চেষ্টা করেন নাই। নিরীহ লোকদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেন; কিন্তু সর্ব্বদা দুষ্টের দমনে প্রয়াস পাইতেন। নেতৃত্ব তাঁহার পক্ষে এত সহজ ছিল যে, সহপাঠিগণ স্বভাবতঃই তাঁহার নিকট মাথা নোয়াইত। তাঁহার জীবনে অতি মহৎ কার্য্য আছে তখনও সেই জ্ঞান ছিল। কেবল একটা আমোদ ও খেলার মধ্যেই যেন তাঁহার কাল কাটিয়া যাইত। তখনও সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। ইহার জন্যও অনেক সময় পড়াশুনার ক্ষতি হইত।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময়, কাশীর আনন্দমঠ হইতে শ্রীমৎ পরমানন্দ পরমহংস নামক একজন সন্ন্যাসী কামাখ্যাদর্শনে আসিয়া-ছিলেন। ফিরিবার সময় ঠাকুরের বাড়ীতে আসেন। ইনি একজন উন্নত যোগী ও নানা শাস্ত্রদর্শী ছিলেন, এবং শাস্ত্রের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। সন্ন্যাসী একটু পানীয় জল চাহিলে ঠাকুর তাঁহাকে শুধু জল না দিয়া এক গ্লাস জল, একটু দুধ ও কলা খাইতে দেন। তিনি তিন দিন তাঁহাদের বাড়ীতে ছিলেন। ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে এক বিছানায় শুইতেন। তৃতীয় রাত্রে বারোটার সময় সন্ন্যাসী হঠাৎ কোথায় বাহির হইয়া যান; ঘণ্টা দু'এক পরে ফিরিয়া আসেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ—চেহারায় এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের বিকাশ হইয়াছে।

তিনি ঠাকুরকে ডাকিয়া ঘুম হইতে জাগাইলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া ঠাকুরের বড় ভয় হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "কোনও ভয় নাই, আমি প্রভাতে চলিয়া যাইতেছি, একটী জিনিষ দিয়া যাইব, যত্ন করিয়া রাখিও।" এই বলিয়া একটী কবচ দিলেন। ঠাকুর কবচটী কোথায় রাখিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময় সন্ন্যাসী এক টুকরা কাগজ চাহিলেন। তিনি তখন আসন করিয়া বসিয়াছেন। এত রাত্রে কোথায় কাগজ পাইবেন? হঠাৎ উর্দ্ধদিকে কাগজের ছাদের দিকে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পড়িল। তিনি আসনাবস্থায়ই শূন্যে উঠিয়া নিমেষ-মধ্যে ছাদ হইতে এক টুকরা কাগজ ছিড়িয়া আনিলেন। ঠাকুর এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী কাগজে কি লিখিয়া বলিলেন 'ইহার মধ্যে তাবিজটা রাখিও'; ইহার সাত মাস পরে কবচটী হারাইয়া যায়। কবচটী পাওয়ার পর হইতেই তাঁহার প্রাণে একটা ধর্ম্মভাব জাগিতে থাকে।

এণ্টান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াই ঠাকুর পিতার নিষেধ সত্ত্বেও পড়া ছাড়িয়া দেন। পরে গৌহাটীতে সেন্‌সাস্ আফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। এইখানে পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। অনেকেই বিবেকানন্দকে দেখিতে গিয়াছিলেন, ঠাকুরও এদের মধ্যে ছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহাকে ডাকিয়া নির্জ্জনে দেখা করিতে বলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপেই ঠাকুরের কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। বিবেকা-নন্দের প্রতি তখন হইতেই তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তাঁহাকে গুরু বলিয়াও তিনি অনেক সময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার দীক্ষাগুরু নহেন। গৌহাটীতে আরও অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ

হইয়াছিল, সেইখানেই সাধনা ও ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। সাধন-প্রাপ্তির সময় এইরূপ আদেশ হয় যে 'চারি বৎসর পর্য্যন্ত রাত্রে দুই ঘণ্টা কাল মাত্র সাধন করিতে হইবে। সাধন কালে বিশেষ উন্নতি দেখা যাইবে না; কিন্তু চারি বৎসর পর আপনা হইতেই সমস্ত শক্তি বিকশিত হইতে থাকিবে, বহু লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। ধর্ম্মজগতে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইবে।'

ইহার কয়েকমাস পরে ১৩০৮ বাং ফাল্গুন মাসে ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছ গ্রামের বিখ্যাত তলাপাত্র-বংশে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম 'সর্ব্বমঙ্গলা'। ঠাকুর একবার প্রিয় শিষ্য জয়কিশোর বাবুকে (স্বামী চিদানন্দ) সঙ্গে নিয়া কালীকচ্ছে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। ঠাকুরের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করায় স্বামী চিদানন্দের* সঙ্গে তাঁহাদের বিষম তর্ক বাঁধিয়া যায়। তেজস্বী চিদানন্দ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন 'এই যে আপনারা এত গুলি লোক, আপনাদের মধ্যে কয়জন ব্রাহ্মণ আছেন?' ব্রাহ্মণ-সমাজ ইহাতে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠেন। গণ্ডগোল শুনিয়া ঠাকুর আসিলে তাঁহারা এই নিয়া অভিযোগ করেন। ঠাকুর তখন গম্ভীর-স্বরে বলিলেন "সে বেশ বলিয়াছে; আপনারা বৃথা অভিমান করিতেছেন। ব্রাহ্মণের বাক্যে একটা শক্তি থাকিবেই; আপনাদের কথায় সে শক্তি কৈ?" তাঁহারা বলিলেন "কেন, আমাদের কি শক্তি নাই?" ঠাকুর বলিলেন "শক্তি

* ইনি বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, শ্রীহট্টের অন্তর্গত বানিয়াচুঙ্গ গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম; বর্ত্তমানে ইনিই আশ্রমের অধ্যক্ষ

থাকা ত দূরের কথা, আপনাদের কথা বলিবার শক্তিই হইবে না। শক্তি থাকে ত বলুন?" ইহা বলিয়া ঠাকুর উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন।

গৌহাটী ও শিলং পনর মাস কাল চাকুরী করিয়া ঠাকুর, তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্র শিলচরে চলিয়া আসেন। এখানে তিনি লোকেল-বোর্ড আফিসে কেরাণী নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি যথাসময়ে আফিসে যাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে দৈনিক কাজ শেষ করিয়া ফেলিতেন। করিব বলিয়া কোনও কাজ রাখিয়া দেওয়া তাঁহার স্বভাব নহে। শিষ্যদিগকেও কথায় এবং কার্য্যে নানা ভাবে এই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের (প্রণবানন্দ) নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "কেহ কর্ত্তব্যে ত্রুটি করিলে আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি নিজে কোনও কাজ করিব বলিয়া এক মুহূর্ত্তও ফেলিয়া রাখিতে পারি না।" চাকুরী অবস্থায়ও তিনি সর্ব্বদা সৎসাহসের পরিচয় দিতেন।

প্রথম ভক্তবৃন্দ*—দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ।

ঠাকুরের প্রথম ভক্ত রাধিকানাথ মণ্ডল (সত্যানন্দ) শিলচরের একজন প্রধান ব্যবসায়ী—ইনি ঠাকুরের অতি প্রিয়পাত্র; ঠাকুর তাঁহার জন্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে বাজারের কোন দোকানে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দুজনে প্রায়ই একত্র কীর্ত্তন শুনিতে যাইতেন। এই সময় নকুল+ ও অপর একজন সাধু শিলচরে আসেন। নকুল সাধুর— ভাব দেখিয়া রাধিকা বাবুর বিশেষ শ্রদ্ধা হয় এবং ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার মন ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠে। "শ্রীশ্রীদয়ানন্দ লীলামৃত" গ্রন্থে রাধিকা বাবু এই সময়কার অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে ঠাকুরের অসীম আত্ম-গোপন এবং অপূর্ব্ব শিক্ষা-দান-প্রণালী সম্বন্ধে আলোক পাওয়া যাইবে।

"......ঠাকুর প্রত্যহই আমার ঘরে আসেন উপদেশাদি দেন। এই সময় বুঝিতাম তিনি ও আমি এক রাস্তার পথিক, এর বেশী কিছু নয়। আমার এই অবস্থায় ঠাকুর একদিন 'অন্ধের যষ্টি' নামক একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। ঠাকুর পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

---

* এই পুস্তকে সমস্ত ভক্তের নামোল্লেখ করা অসম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে যাহাদের কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে পাদটীকায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

+ কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত মেড্ডা গ্রামে ইহার বাসস্থান—ইহারা জাতিতে বণিক্য; এতদঞ্চলে একজন প্রেমিক ভক্ত বলিয়া সুপরিচিত।

আমারও বিশেষ উপকার হইল। কিসে ভগবানকে পাইব তাহাই খুঁজিতেছিলাম, কিন্তু পাবার রাস্তা জানি না। পুস্তকখানিতে বুঝিলাম নাম সম্বল করিয়া রওয়ানা হইলে নামই রাস্তা দেখাইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। ইহার পর আমি অবিরত নাম করিতে লাগিলাম, একে পূর্ণ অনুরাগ—তাহাতে নামের ক্রিয়া, আমাকে একেবারে বিভোর করিয়া রাখিল। অনেক সময় মনে হইত সম্ভবই ভগবানকে পাইব। এই সময় তত্ত্বমঞ্জরী নামক মাসিক পত্রিকা আনাইয়া তাহাই প্রত্যহ ঠাকুর পাঠ করিতেন। আমার তাহাতে বেশ উপকার হইতে লাগিল। ঠাকুরের দিকে ক্রমে একটা টান হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর এক ছড়া ফুলের মালা গলায় দিয়া আমার গলায় দিলেন। আমি বলিলাম 'মালা বিনিময়ের কথা যেন চিরদিন মনে থাকে।' ঠাকুর হাসিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর আসিয়া বলিলেন 'চল বাজারে কীর্ত্তনে যাই।' মন বড় অস্থির ছিল। কি করিব? কিসে তাঁহাকে পাইব? কিন্তু ঠাকুরের কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কতদূর গিয়া রাস্তায় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলাম 'তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও' তিনি বলিলেন, 'আমি কি করিব? তুমি কি পাগল হইলে? এক অন্ধ কি অন্য অন্ধকে পথ দেখাইয়া দিতে পারে?' অনেক পীড়াপীড়ির পর বলিলেন 'আচ্ছা যদি তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে আমি যতদূর পারি জানাইব।'"

ইহার অল্প দিন পরে দোলপূর্ণিমার দিনে রাধিকা বাবুর অতি উচ্চ ভাব হইয়াছিল। তিনি অমৃতময়ের অমৃতস্পর্শ প্রাণে অনুভব

করিয়াছিলেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন—"আমার শরীর যেন কেমন এক অপার্থিব ভাবে বিভোর হইল; ক্রমে সে ভাব গভীরতর হইতে লাগিল। যাহা কিছু দেখি বা করি কেবলই আনন্দ। আনন্দ আর শরীরে ধরে না; পুকুর হইতে মাছ ধরিতে লোক আসিল, হুকুম দিতে পারিলাম না। দেখি আমিও যা মাছগুলিও তাই—পুকুরপারে জঙ্গলা গাছ, তাহাও পরিষ্কার করিতে হুকুম দিতে পারিলাম না। মুচীরা গান করিতে করিতে আমার দোকানে আসিল, তাহারা আমাকে আবির দিতে লাগিল, আমার বেশ আনন্দ হইতেছিল, ইচ্ছা হয় তাদের ধরিয়া কোল দেই, তাহারা কিন্তু ভয় পাইতেছিল। ইহার পরদিন ঠাকুর আমার বিছানায় শুইয়া আস্তে আস্তে আমাকে ডাকিলেন ও তাঁহার শরীরে আমার হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় হাত বুলাইতে বুলাইতে আমার সে ভাব অন্তর্হিত হইল। তখন কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলাম। ঠাকুরের কাছে কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন—'তুমি তিন দিনে রাজা হইয়াছিলে, কাজেই রাজত্বও তিন দিনেই গেল।'"

ইহার পাঁচ সাত দিন পরেই ঠাকুর তাহাকে সাধনপ্রণালী দিয়াছিলেন। প্রায় এই সময়ে গুরুদাস রাহা (দেবানন্দ)* ও ললিতচন্দ্র বসু (জ্ঞানানন্দ)† ঠাকুরের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করেন। প্রথমদর্শনে রাহা মহাশয়ের কিছু মাত্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় নাই। তাঁহার

* ত্রিপুরার অন্তর্গত চিত্‌না গ্রামে ইহার বাসস্থান, প্রায় ২৬ বৎসর কাল শিলচরের ডেপুটীকমিশনার আফিসে চাকুরী করিয়াছেন, বয়স ৫৫ বৎসর, দশমবর্ষীয় একটী পুত্রকে আশ্রমে দান করিয়াছেন।

† ঢাকা বিক্রমপুরে জন্ম, বয়স ৪৫ বৎসর; বর্ত্তমানে শিলচর লোকেলবোর্ডে সবওবার্সিয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

মনে হইয়াছিল ইনি বড় চঞ্চল ও উদ্ধত-স্বভাব। অতি ধীরে ধীরে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার স্বরচিত বিবরণটী বড়ই শিক্ষাপ্রদ। নিম্নে সংক্ষেপে ইহার সারভাগ উদ্ধৃত হইল। তিনিও তখন বাজারে মাঝে মাঝে কীর্ত্তন শুনিতে যাইতেন। তাঁহার বয়স তখন প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর।

"......একদিন—র দোকানে কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময় রাধিকা মণ্ডলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, লোকটী বড় প্রিয়দর্শন—হাসিমুখ—দেখিয়াই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল। আর একদিন বাজারে গিয়া জানিলাম মালুগ্রাম বৈকুণ্ঠ গুপ্তের বাসায় ৺রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাজারের লোকের কীর্ত্তন হইয়াছিল। গুরুদাস চৌধুরীও (ঠাকুরের পূর্ব্ব নাম) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাহার বড় ভাব হইয়াছিল।...... মনে মনে বলিলাম 'লোকটী পাকা বদমায়েস্, এত অল্পবয়সেই ভাব করিতে শিখিয়াছে, বাজারের লোক মজাইতে পারিবে।'......কিছু দিন পরে—র ঘরে কীর্ত্তন হইল; মানগোবিন্দ (অমৃতানন্দ) বাবুর পিতা ও রাধিকা বাবু সহ ঠাকুর তথায় উপস্থিত। সেদিন চেহারা দেখিয়া তেমন বিরক্তি বোধ হইল না; কীর্ত্তন ভালই হইয়াছিল। তাঁহার ভাব হইল। বেশ করিয়া দেখিলাম, প্রাণে প্রাণে বুঝিলাম এটী কৃত্রিম ভাব নয়। তখন প্রাণে অন্য ভাব আসিতে লাগিল। ছেলেটা ধর্ম্মানুরাগী হইবে ঠাওরাইলাম।......সেদিন হইতে—প্রায়ই কীর্ত্তনে দেখা হয়, পথে ঘাটেও দেখা পাই; বেশ যেন একটু ভাল লাগিতে লাগিল। ললিত বাবুও রাধিকার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে একটু আত্মীয়তা হইতে লাগিল। এই সময়ে নকুল সাধু শিলচরে আসেন,

এই সময়েই ঠাকুর বাজারে আমাকে "মিত্র মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করেন। কেন জানি না সেই মুহূর্ত্তেই মনে হইল 'আমি কোনও মতেই তাঁহার মিত্র সম্বোধনের যোগ্য হইতে পারি না, এটী তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক।' একদিন রাত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মিত্র মহাশয়, ———কে আপনি কেমন মনে করেন?' আমি বলিলাম 'ইনি মুক্ত-পুরুষ'; তিনি বলিলেন 'না তেমন নয়, নকুল খাঁটি সাধু।' সত্বরই হাতে হাতে প্রমাণ পাইলাম।"

এই সময় প্রায় দুই তিন মাস ঠাকুর সর্ব্বদা কীর্ত্তনে বিভোর থাকিতেন। দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিত না। কখনও বা দীনহীন অকিঞ্চন ভাবে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যার তার কাছে ভক্তি ভিক্ষা চাহিতেন। কখনও বা জীবের দুঃখ চিন্তা করিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতেন। সর্ব্বদাই মনে হইত তাঁহার এই সব ভাব অন্য প্রাণে সঞ্চারিত হউক, জীব সকল তাঁহার অবস্থা লাভ করুক। এক রাত্রে নকুল সাধু প্রেমে বিভোর হইয়া বক্তৃতাচ্ছলে নানা উপদেশ দিতে থাকেন। ঠাকুর ও অপরাপর কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন; তিনি নকুলের উপদেশ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন; তাহার নিকট প্রেম ভক্তি ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া নকুল বলিয়াছিলেন— 'কৃষ্ণ ইচ্ছা হইলে প্রেম পাইবেন।' এমনি ভাবে যখন তখন যার তার কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিতেন; নিতান্ত নিম্নস্তরের লোক হইলেও, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

রাহা মহাশয় লিখিতেছেন "...একদিন অপরাহ্নে ঠাকুর, আমি ও রাধিকা নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম; একটী গাছের তলায় বসিয়া

নদী, পাহাড় ইত্যাদি দেখিতে লাগিলাম। বহুদিন যাবৎ মনে হইত, পরিবার পরিজন থাকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মে মন দিবার প্রয়োজন নাই; যদি এমন সময় কখনও হয় ইহারা কেহ না থাকে, তখন ধর্ম্মের জন্য যাহা করিতে হয় করিব। এ কথাটী বহুদিন যাবৎ হৃদয়ের নিভৃত-কক্ষে লুক্কায়িত ছিল; কাহাকে কখনও বলি নাই; জলের কথা, পাহাড়ের কথা—কত কথা হইল; কি উদ্দেশ্যে কি কথা হইল, তখন কিছুই বুঝিলাম না। কেবল একটী প্রশ্ন মনে আছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন 'জলটা এমন নাচিয়া নাচিয়া কোথায় যাইতেছে?' আমরা বলিলাম 'সাগরে।' তিনি বলিলেন 'হাঁ, সাগরের দিকেই চলেছে, আর যতই বাধা পা'ক না কেন একদিন না একদিন সাগরে গিয়া পৌঁছিবেই। জল সাগরকে চায়, সাগরও জল চায়; এই প্রকার জীব ও ভগবানের দিকে চলেছে; আর একদিন না একদিন সেখানে পৌঁছিবেই।' আবার অন্য কথা হইল, কিছুক্ষণ পরে ক্ষীণ-স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছা পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র সব মরিয়া গেলে ধর্ম্ম করা হইবে এমন মনে হয় নাকি?' আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, আমার এই প্রচ্ছন্ন ভাব এ মানুষটা কি করিয়া জানিল? কিন্তু তিনি অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন, তখনও এ বিশ্বাস হইল না। ভাবিলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারও এই মনের ভাব, নতুবা বলিবেন কি করিয়া?......ঠাকুর গান ধরিলেন 'দিবা অবসান হ'ল' আমিও সাহায্য করিলাম; রাধিকা ভাবস্থ হইল; পরে জানিলাম এই দিনই তাহার প্রথম ভাব হয়।

আমাদের অধিবেশন ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। প্রায়ই পাঠ, হরি-কথা বা কীর্ত্তন হইত। রাধিকার ভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল;

এমন কি কীর্ত্তনে যাইতে হইলে, পথেই সে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িত। তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইত।

একদিন রাধিকার হরি-মন্দিরে বসিয়াছি। সে ঘরে কেবল ঠাকুর ও আমি; রাধিকা কার্য্যান্তরে ছিল। আমি পা গুটাইয়া রাখিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন 'আসনের (বিষ্ণুর আসন) দিকে পা' রাখিতে দোষ কি?' আমি বলিলাম 'দোষ নাই, তবে মনে কেমন কেমন লাগে।' তিনি বিষ্ণুর আসন দেখাইয়া বলিলেন 'আমি আসনের উপর পা' রাখিতে পারি?' কথাটা প্রাণে বড় বাজিল; ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস—অসীম প্রাণের বল না থাকিলে এমন কথা কাহারও মুখে বাহির হইতে পারে না...এই দিন হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রণিপাত করিলাম।

......আর একদিন রাত্রে আসিয়া দেখিলাম ঠাকুর রাধিকার গদীর দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট; আমি ও রাধিকা উত্তরের চৌকিতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, তিনি যেন ঘুমাইয়া পড়িয়া যান; রাধিকা ব্যস্ততা সহকারে গিয়া ধরিল; দেখিল ঘুম নয়—ভাবের ঘুম। হাত পা সব ঠাণ্ডা ও শক্ত হইয়া গিয়াছে। একটা আঙ্গুল পর্য্যন্ত সোজা করা যায় না; আমি ভগবানকে কাতর-প্রাণে ডাকিয়া বলিলাম 'ইহাদের এমন সুন্দর ভাব হয়, আমার হৃদয় এত পাষাণ যে, জীবনের মধ্যে একদিনও এ অবস্থা হইল না। আমি তো বড় নরাধম।' ঠাকুর অর্দ্ধ-সংজ্ঞাবস্থায় ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। আমারও ইচ্ছা হইল প্রণাম করি, লজ্জায় করিলাম না। প্রণামের কোনও প্রয়োজন আছে কি না তাহাও বুঝিলাম না। তিনি চৌকিতে

উঠিয়া বসিলেন; খানিক পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; 'কি রাহা মহাশয়! আজ কি মনে হয়?' তখন বলিলাম 'আপনাদের ভাব দেখিয়া বড়ই আত্ম-গ্লানি হইতেছে। আমার এমন একদিনও হয় না কেন?' তিনি বলিলেন 'তুমি প্রণাম করিলে না কেন?' আমি বলিলাম 'কখন?' তিনি বলিলেন 'আমি যখন প্রণত হইয়াছিলাম।' আমি বলিলাম 'বুঝিতে পারি নাই—ক্ষমা করুন্।' পরে আমার আকুল প্রার্থনায় বলিলেন 'ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে যদি কিছু কাজ হয়, তবে অচিরেই তুমিও ভাবাবিষ্ট হইবে।'

......এর পর একদিন সন্ধ্যার সময় রাধিকার ঘরে বসিয়াছি। কথা হইল যে ঠাকুর-ঘরে গিয়া "ভক্তি ও ভক্ত" পাঠ হইবে।... নিবিষ্ট-চিত্তে শুনিতে লাগিলাম; বড়ই মধুর বোধ হইতে লাগিল। এ গল্প আরও পড়িয়াছি, আরও শুনিয়াছি তবু এমন যেন কোনও দিন শুনি নাই। কেমন এক অপূর্ব্ব ভাব; প্রাণে এমন এক আনন্দ হইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে কখনও উপলব্ধি করি নাই। ঠাকুর গল্পের প্রথম হইতে আবার পড়িতে লাগিলেন, প্রতি কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিতে লাগিল; পরে সংজ্ঞা-লাভ করিলাম; সংসার যেন নূতন বোধ হইতে লাগিল। কলির এই দুর্দ্দিনেও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ফলে, দেখিলাম।"

এই সময় পুলিশবিভাগের মহেন্দ্র বাবুর সাংঘাতিক পীড়া হয়। ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। ঠাকুরের সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিষয়েই তাঁহার মতের মিল ছিল। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি দুজনেরই সমান শ্রদ্ধা। তিনি যখন পুলিশবিভাগে প্রবেশ করেন, তখন ঠাকুরের

প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন "আমি পুলিশ বিভাগের সংস্কার করিব।" অসুখের সময় ঠাকুর নিজে সরোজানন্দকে* লইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। রাত্রি ১০।১১টার সময় সকলে বলিতেছিল—মৃত্যু সন্নিকট, এখন তাঁহাকে ঘরের বাহির করা উচিত। ডাক্তারের জন্য পাঠান হইল, কিন্তু ডাক্তারের কথায় কিছুমাত্র আশ্বাস পাওয়া গেল না; ঠাকুর কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বাহির করিতে দিলেন না। মহেন্দ্রের দ্বারা খুব বড় কাজ হইবে—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। মনে মনে মাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা, এমন লোক অসময়ে কেন চলিয়া যাইবে!" রাধিকা বাবু সঙ্গেই ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন "যাও, বিষ্ণুর আসন হইতে একটী পূজার ফুল আনিয়া দাও।" রাধিকা বাবু সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিজ হাতে আসন পরিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন;— তিনি বলিলেন "আসনের সব ফুল ফেলিয়া দিয়াছি—আসনে এখন ফুল নাই।" ঠাকুর বলিলেন "যাও, আসনে ফুল আছে।" রাধিকা বাবু বাসায় আসিয়া দেখেন সত্য সত্যই একটী ফুল রহিয়াছে। ফুলটী লোক সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন, মহেন্দ্রের মা ফুলটী কপালে ছোঁয়াইয়া বালিসের নীচে রাখিয়া দিলেন। ইহার পর দিন হইতেই তিনি আরোগ্যলাভ করিতে থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা রোগ ভাল করা, কিংবা সাংসারিক কোনও অভাব পূর্ণ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ। তাঁহার জীবনে শত শত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। এরূপ ঘটনা যে

---

* শ্রীহট্টের অন্তর্গত পৈল গ্রামে জন্ম, নাম—সরোজমোহন পাল; বর্ত্তমানে হবিগঞ্জ লোকেল-বোর্ড আফিসে কর্ম্ম করিতেছেন।

ঘটিতে পারে এবং অনেক ঘটিয়াছে! আমি নিজে তাহার সাক্ষ্য দিতে পারি। আরও অনেকেই পারেন। মনগড়া যুক্তি দিয়া ঘটনাকে উড়াইয়া দিতে যাওয়া, মূর্খতার একশেষ। হাক্সলি, টিণ্ডাল্ অরণ্যে রোদন করিয়াছেন। অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস শতগুণ বেগে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু, অলৌকিক ঘটনা দ্বারা চরিত্রের বিচার করা যায় না। ঠাকুরকে যখনই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে "এ টা কিরূপে হইল!" তখনই তিনি বলিয়াছেন "আমি এর কিছু জানিনা, ভগবানের শক্তিতে হইয়াছে; সাবধান, এসমস্ত বুজরুকীর কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিও না।" এই গ্রন্থে নিতান্ত অপরিহার্য্য স্থল ব্যতীত যথাসম্ভব অলৌকিক ঘটনা বর্জ্জন করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ঠাকুরের নিজের জ্বর হয়—পর দিন হাম বাহির হইল। গুরুদাস রাহা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জানেন। তিনিই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। নাড়ীতে হাত দিয়া পরীক্ষা করিবার সময় মনে সন্দেহ হইল, হাম রোগটা সংক্রামক কি না। হঠাৎ দেখেন, ঠাকুর শিহরিয়া উঠিলেন। কিছু না বলিয়া নীচে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সরোজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ভাই, তোমরা কেউ ভয় পাইওনা, আমাকে ছুঁইলে তোমাদের কাহারও ব্যারাম হইবে না। এ বিষয়ে কাহারোও সন্দেহ থাকিলে নিশ্চিন্ত হও।" গুরুদাস বাবু লজ্জায় অধোবদন হইলেন। নদীতীরের সে ঘটনাটী তাঁহার মনে পড়িল।

১৩১২ বাংলার প্রথম ভাগে ঠাকুরের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ যখন আসিল, রাধিকা বাবু তখন সঙ্গেই ছিলেন। তিনি

তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া আসিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের অবিচলিত ভাব দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন।

প্রায় এই সময়েই ঠাকুরের বাসা পুড়িয়া যায়। তিনি নূতন বাসায় চলিয়া আসেন। গুরুদাস রাহা তাঁহার প্রতিবাসী ছিলেন। নূতন বাসায় আসার পর একদিন ঠাকুরের বাসায় কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনে বাজারের লোক ও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি নয়টার পর একটি বৃহৎ প্রজাপতি আসিয়া দেবতার আসনে একখানি চিত্রপটে বসিল। ক্রমে চিত্র হইতে চিত্রান্তরে উড়িয়া, অবশেষে ঠাকুরের বুকে আসিয়া বসিল। বুকের উপর অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া আবার আসনে দেবতার ছবিতে যাইয়া বসিল। প্রথমে অনেকেই প্রজাপতিটাকে মারিতে চাইয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর তাহাদিগকে নিষেধ করেন। প্রজাপতিটী বসার পর হইতেই ঠাকুরের শরীর ভাবস্থ হইতে থাকে। ভাব এত গভীর হইয়াছিল যে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাষ্ঠবৎ কঠিন ও শীতল হইয়া উঠে। সে দিন অনেকক্ষণ পর তাঁহার সংজ্ঞা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠাকুরের পূজা ও কীর্ত্তনাদিতে অনেক সময় সর্প, পেঁচক, প্রজাপতি, ক্ষেমঙ্করী প্রভৃতি আসিয়া নৃত্য করিয়াছে। এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না—সময় সময় তিনি ইহাদিগকে ধরিয়া আসনে বসাইয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঠাকুরের মানসিক অবস্থার বিষম পরিবর্ত্তন হইল। তিনি নিজেই পাক করিয়া খাইতেন, সরোজ সমস্ত আয়োজন করিয়া দিত। নানা দিকে অসুবিধা, কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিলনা—পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কোনও কোনও দিন একবারে ভাবে

বিভোর হইয়া থাকিতেন। আহার নিদ্রা হইত না, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না। কোনও কোনও দিন একাকী পাক করিতেছেন এমন সময় গান ধরিলেন। 'হরে মুরারে'—গান করিতে করিতে ভাবস্থ হইলেন। পাক-শাক কোথায় পড়িয়া রহিল।

এই সময়ে তারাপুরে একজন ভৈরবী আসেন; গুরুদাস রাহা অনেক অনুরোধ করিয়া তাহাকে নিজ বাসায় নিয়া যান। সেখানে কয়েক দিন থাকার পর একদিন সরোজানন্দ ভৈরবী-চক্র কিরূপ দেখিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করেন এবং নিজেই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হন। ঠাকুরের বাসায়ই সমস্ত আয়োজন হয়। ভক্তবৃন্দ এবং সহরের অনেক পদস্থ ব্যক্তি কৌতূহলী হইয়া দেখিতে আসেন। নানাজাতীয় শুদ্ধি (পোড়া মাছ, ভাজা ছোলা, আদা, লঙ্কা, মদ্য প্রভৃতি) সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ভৈরবী যথারীতি শোধন করিয়া মদ খাইতে আরম্ভ করিলেন ও উপস্থিত সকলকে প্রসাদ লইতে অনুরোধ করিলেন। কেহ কেহ প্রসাদ লইতে অসম্মত হইলে তিনি তাহাদিগকে ত্রিশূল তুলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। নিরীহ ভক্তদিগের উপর এইরূপ অযথা অত্যাচারে ঠাকুরের মর্ম্মে বড়ই বাজিল। কি ভাবে তাঁহাকে শিক্ষা দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ভৈরবী তাঁহাকে প্রসাদ লইতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর প্রসাদ নিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন—"এই একটুকু প্রসাদে আমার কি হইবে। ইহাতে আমার তৃপ্তি হইবে না।" ভৈরবী আস্ফালন করিয়া বলিলেন "তুমি কতটুকু প্রসাদ খাইতে পারিবে? আমি স্বয়ং মা—আমার ভাণ্ডার অফুরন্ত।" ঠাকুর বলিলেন—"আমি যত খাইতে পারি দিবার কি তোমার শক্তি হইবে? যত খাইতে

পারি না দিলে কিন্তু চলিবে না।"\ ভৈরবী সম্মত হইলে ঠাকুর আসন করিয়া প্রসাদ খাইতে বসিলেন। এর পূর্ব্বে তিনি কখনও মদ খান নাই। নারিকেলের পাত্রে দুই তিন পাত্র মদ খাওয়ার পরই ভৈরবী তাঁহাকে মহা-পাত্র (নর-কপালে নির্ম্মিত—তান্ত্রিকদের চক্ষে পরম পবিত্র —উচ্চাধিকারী ব্যতীত কাহাকেও ইহা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না) দিলেন। ঠাকুর যখন একটিন্ মদ নিঃশেষ করিয়া চাহিলেন "প্রসাদ কোথায়?" ভৈরবী তখন আতঙ্কে কাঁপিতেছেন—সরোজকে বলিলেন—'আমি নিজে টাকা দিতেছি, দোকান হইতে মদ নিয়া এস।' ঠাকুর জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কি? আমি কি শুঁড়ির দোকানের মদ খাইতে বসিয়াছি? তুমি না মা? তোমার ভাণ্ডার না অফুরন্ত? আমাকে প্রসাদ দিতেই হইবে।" ভৈরবী শরণাগত হইয়া মিষ্ট-বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চাহিলেন। তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, আর যেন কখনও এরূপ ভাবে জোর করিয়া কাহাকেও প্রসাদ লইতে বাধ্য না করেন। সেই অবধি ভৈরবী তাঁহাকে 'গণেশ' বলিয়া ডাকিতেন। এখনও তাঁহাকে দেখিলে বড় সন্তুষ্ট হন।

এই সময় ঠাকুরের বৈঠকখানায় প্রায়ই কীর্ত্তন হইত। সন্ধ্যাকালে ললিতবাবু, গোবিন্দবাবু (অচ্যুতানন্দ)* অখিলবাবু (সদানন্দ)† রাধিকা বাবু, বামাচরণ ধর (নিত্যানন্দ)‡ গুরুদাস

* ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নাছিরপুর গ্রামে বাসস্থান. বর্ত্তমান বয়স ৪৫ বৎসর, ১৪ বৎসর কাল লোকেল-বোর্ডে সব্ ওভারশিয়ার ছিলেন।

† ঢাকা মহেশ্বরদীর অন্তর্গত পারুলিয়া গ্রামের অধিবাসী, দীর্ঘকাল শিলচরে থাকিয়া চাকুরী করিয়াছেন, বয়স আনুমানিক ৪২।৪৩ বৎসর।

‡ বাড়ী শ্রীহট্টের অন্তর্গত গুমগুমিয়া গ্রামে, বয়স ৩৬ বৎসর; শিলচরের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর কারবারে প্রধান কর্ম্মচারী।

রাহা প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ একত্রিত হইতেন। কীর্ত্তন ও ভগবৎ-প্রসঙ্গে অনেক রাত্রি কাটিয়া যাইত। ধূপ, দীপ জ্বালিয়া নিয়তই কিছু কিছু কীর্ত্তন হইত। গায়ক কেহই ভাল ছিলেন না, তাল মানের দিকে দৃষ্টি ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, আমি ভাব চাই—তাল মান চাই না; কিন্তু আনন্দের অভাব হইত না। কোন দিন ললিত বাবুর বাসায়, কোন দিন রাধিকা বাবুর ঘরে, কোন দিন বা বাজারেও কীর্ত্তন হইত। এই ভাবে দিন যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় বার বিবাহে ঠাকুরের একান্ত অনিচ্ছা ছিল; শেষে, পিতামাতার বিশেষ অনুরোধে বিবাহ করিতে সম্মত হন। ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বনগ্রামে দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম—কাদম্বিনী। মা সরলতার আধার, রূপে গুণে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্যের তুলনা হয় না। স্বামীসন্দর্শনের সৌভাগ্য অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্বামীকে তিনি এক দিনও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে অনুরোধ করেন নাই।

বিবাহের পর বনগ্রাম হইতে ফিরিবার সময় ঠাকুর গৌর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছিলেন। "গৌর" "গৌর" বলিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে নদীতে ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলেন। পিতা ও সঙ্গীরা মনে করিয়াছিলন, স্ত্রী মনোমত না হওয়ায় তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা তিনি অতি অল্পদিন পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

১৩১৩ বাঙ্গালার পৌষ মাসে ঠাকুর একদিন ভক্তবৃন্দসহ টিলাইন টিলায় বনভোজনে যান। সেই দিনই তিনি আশ্রমের টিলাটী দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "ঐ টিলাটী কেমন সুন্দর! এই দিক্‌কার সমস্ত টিলার চেয়ে এই টিলাটীই ভাল।"

পর বৎসর পূজার ছুটীর পরে ঠাকুর আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। 'সহরে থাকিয়া সাধনা করা কষ্টকর, গোলমালে কাজের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ সাধু সন্ন্যাসী সহরে আসিয়া স্থান পায় না। টিলাইন টিলাটী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া নিতে পারিলে, সেইস্থানে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া কয়েকখানি সাধন কুটীর তৈয়ার করিতে পারিলে ভাল হয়'। তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সকলেরই ইহাতে মত হইল; কিছু কিছু চাঁদা দেওয়াও সাব্যস্থ হইল। কিন্তু টিলাইন টিলাটী বন্দোবস্ত পাওয়া গেল না। পরে আশ্রমের টিলাটী খরিদ করিয়া ১৩১৫ বংলার পৌষ সংক্রান্তিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশ্রমের নাম রাখা হইল 'অরুণাচল'; পুলিশ বিভাগের মহেন্দ্র বাবু নামটী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

শিলচর সহরের তিন মাইল পশ্চিমে টিলাইনের অধিত্যকা দেশে একটী ক্ষুদ্র টিলার উপর আশ্রম। আশ্রমের অদূরে উত্তর পূর্ব্ব কোণে টিলাইন টিলা। ইহার পৃষ্ঠদেশ একখানি টেবিলের মত সমতল। এইখানে দাঁড়াইয়া যে দৃশ্যটী দেখা যায় তাহার শোভা বর্ণনাতীত। দক্ষিণে আশ্রম—আশ্রমের পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি চলে শ্যামল পর্ব্বতমালা।

সম্মুখে সীমারেখার মত আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে লাইন। পশ্চিমে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। উত্তরে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে প্রবাহিত স্বচ্ছ-সলিল বরবক্র। নদী-তীরে হিল্লোলিত বেণুবন। অনতিদূরে থরে থরে বিন্যস্ত ধূম্রবর্ণ পর্ব্বতরাজি প্রাকারের মত দণ্ডায়মান। টিলাইন টিলার পাদদেশে প্রকৃতি-নির্ম্মিত অতি সুন্দর ঘাট; দেখিলে মনে হয় যেন আশ্রমবাসীদের ব্যবহারার্থ প্রকৃতি দেবী পূর্ব্ব হইতেই ইহা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

যেদিন টিলা পরিষ্কার আরম্ভ হয়, সেই দিনই একজন পাগল আসিয়া মার মন্দিরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যায়। কিছুদিন পরে দুইজন সন্ন্যাসী ও একজন সন্ন্যাসিনী সহরে আসেন। তাঁহাদিগকে আশ্রমের টিলার উপর নিয়া যাওয়া হয়। সন্ন্যাসিনী বলিয়াছিলেন "আমি চোখে চোখে দেখিতেছি, এই স্থান একটী মহাতীর্থে পরিণত হইবে।"

আশ্রম-ঘর এবং মার মন্দির নির্ম্মাণেই চাঁদার টাকা নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখন আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ভিক্ষা দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করাই স্থির হয়। ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ নিজে ভিক্ষায় না গিয়া এককালীন অর্থ-সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাহাতে সম্মত হন নাই। ভিক্ষাতে দীনতা ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা হয়—লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ হয়: এজন্য ঠাকুর ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়া সুখ দুঃখ কিরূপ সমভাবে গ্রহণ করিতে হয়, ইহা তিনি উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা নানাপ্রকারে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ইহাও একটী প্রধান উদ্দেশ্য।

১৩১৫ বাঙ্গালার প্রথম ভাগে রাধিকা বাবু, বামাচরণ ধর, গুরুদাস রাহা প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জিলার নানা স্থানে ভিক্ষা

করিতে যান। কার্ত্তিকের শেষভাগে সাধুদের নিমন্ত্রণ এবং পুরোহিত নিযুক্ত করিবার জন্য ঠাকুর রাধিকা বাবুকে নিয়া হবিগঞ্জ যান। সেই সময় একদিন আমাকে ও শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথকে* (বিপুলানন্দ সরস্বতী) দেখাইয়া ঠাকুর রাধিকা বাবুর নিকট অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি তখনই বলিয়াছিলেন "এরা একদিন আমাদের লোক হইবে।" তখন তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। দ্বিতীয় উৎসবের পূর্ব্বে আমি আশ্রমের নাম পর্য্যন্তও শুনি নাই, এবং তখনও ধর্ম্মের প্রতি আমার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না।

মানগোবিন্দ বাবুর (অমৃতানন্দ)+ সম্বন্ধেও তিনি আট বৎসর পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন "তাহাকে আমার কাছে আসিতে হইবে।" এইরূপ ঘটনা আরও অনেক ঘটিয়াছে।

হবিগঞ্জে দু' চা'র দিন থাকিয়া তাঁহারা কালীকচ্ছ যান। গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য নামক একজন বিখ্যাত তান্ত্রিককে পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। কালীকচ্ছ হইতে তাঁহারা সাতমোরার বিখ্যাত সাধক মনোমোহন দত্তের বাড়ীতে যান। বাড়ীর লোকে প্রথমে তাঁহাদিগকে ডিটেক্‌টিভ্ সন্দেহ করিয়াছিল। পরে মনোমোহনের সঙ্গে ঠাকুরের বড়ই অন্তরঙ্গ ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা দু' দিন অপার কীর্ত্তনানন্দে কাটাইয়াছিলেন।

* শ্রীহট্ট জিলার লাখাই গ্রামে জন্ম; কিশোরগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, "মৈত্রী" ও "প্রজাশক্তি" সম্পাদক, "শ্রীশ্রীদয়ানন্দ লীলামৃতের" গ্রন্থকার।

+ শ্রীহট্টের অন্তর্গত হিয়ালা গ্রামে জন্ম, বয়স আনুমানিক ৪৫ বৎসর, শ্রীহট্ট এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার আফিসের হেডক্লার্ক, বহুদিন কৃতিত্বের সহিত শিলচরে মিউনিসিপাল কমিশনারের কাজ করিয়াছেন; কৃষ্ণপুর ফার্ম্মের অধ্যক্ষ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কৃষিশিল্প-বিভাগের মনোনীত সহযোগী (Associate)।

পরে মনোমোহনকে সঙ্গে লইয়া বিখ্যাত কালী-সাধক গুলমামুদের আশ্রমে যান। গুলমামুদ একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। তাহার বাড়ীতে এমন উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হইয়াছিল যে, গাছে গাছে পাখীগুলি একস্থানে কলরব করিয়া উঠিয়াছিল। শৃগাল, কুকুর পর্য্যন্ত সমস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কীর্ত্তনভূমি অবিরাম কম্পিত হইতেছিল। ঠাকুর কাশীতে যাইবেন বুঝিতে পারিয়া গুলমামুদ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিয়াছিল "তুমি কাশী যাও, মাকে এমন ভাবে আনিও, যেন আর কাহারও কাশী যাইতে না হয়।" ইহার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নকুল সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া, ঠাকুর বিগ্রহ আনিবার উদ্দেশ্যে কাশী চলিয়া যান, রাধিকা বাবু শিলচর ফিরিয়া আসেন।

৩০শে পৌষ, আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন। নকুল, গুলমামুদ, মনোমোহন, আপ্তাবদ্দি, ক্ষেপা হরমোহন প্রভৃতি অনেক সাধু আসিলেন। উৎসবের পূর্ব্বরাত্রে আশ্রমে সমস্ত সাধুদের নিয়া কীর্ত্তন হয়। আপ্তাবদ্দি (মনোমোহনের শিষ্য, বিখ্যাত গায়ক) গান ধরিল— "প্রেমের নূতন হাট বসেছে নদীয়ায়" ঠাকুর ও মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রি হইতেই আশ্রমে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। উৎসবের দিন পুরোহিত প্রাতে পূজার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য মার ঘরে গিয়া কবাট বন্ধ করেন। বেলা দু' তিনটা বাজিলে আশ্রম লোকে লোকারণ্য হইল—সহস্র সহস্র দর্শক মাকে দর্শন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন ; তবু কপাট খোলে না। তখন কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, পুরোহিত

ভাবে বিভোর! ঠাকুর ঘরে গিয়া বীজমন্ত্র শুনাইয়া তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করেন। সেইবার উৎসবে সকল শ্রেণীর লোকই যোগ দিয়াছিলেন, অনেকেই বলিয়াছিলেন এ অঞ্চলে ইহার পূর্ব্বে এমন উৎসব আর তা'রা কখনও দেখেন নাই। উৎসবান্তে মনোমোহন গুলমামুদ প্রভৃতিকে নিয়া সকলেই শিলচর ফিরিয়া আসেন। এখানেও তিন চারি দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল।

উৎসবের তিন মাস পূর্ব্বেই ঠাকুর কার্য্য হইতে ছয় মাসের বিদায় গ্রহণ করেন। এর পর আর চাকুরীতে যোগ দেন নাই। কর্ম্মত্যাগে তাঁহার পিতার বিশেষ অমত ছিল। ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না, তখন বলিলেন "আমার ইহাতে কোনও হাত নাই; আর চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার চাকুরী দিয়াই আমার কি হইবে? আমার প্রাণে আসিতেছে এমন দিন আসিবে যখন এ পরিমিত টাকা আমার পান সুপারিতেই খরচ হইয়া যাইবে।" কখনও বা বলিতেন "আজ অবিশ্বাস করিতেছেন—কিন্তু একদিন দেখিতে পাবেন, সহস্র সহস্র লোক আমার পাছে পাছে ছুটিতেছে।"

উৎসবের সময় নিম্নলিখিত কয়জন ভক্ত আশ্রম সেবক ছিলেন—রাধিকানাথ মণ্ডল, গুরুদাস রাহা, ললিতচন্দ্র বসু, গোবিন্দচন্দ্র দে, অখিলচন্দ্র গুপ্ত, বামাচরণ ধর। ঠাকুরের বাল্যবন্ধু সহজানন্দ*ও উৎসবের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বামী চিদানন্দ ঠাকুরের বাসায় থাকিয়াই শিলচরে ওকালতী পড়িতেন।—Spiritualism,

* অনুকূলচন্দ্র পাল—বাড়ী বাণিয়াচঙ্গ পশ্চিমভাগ গ্রামে—বয়স ৩০ বৎসর।

Mesmerism প্রভৃতির প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল—এই সব বিষয়ে অনেক গ্রন্থ ও যন্ত্রাদি কিনিয়াছিলেন। ঠাকুর ক্রমে তাঁহার মনের গতি ধর্ম্মের দিকে ফিরাইয়া দেন। উৎসব উপলক্ষে তিনিও বিশেষ সাহায্য করেন—তথনও তিনি ঠাকুরের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হন নাই।

উৎসবের পরেই ঠাকুর, রাধিকাবাবু, গুরুদাস রাহা এবং ক্ষেপা হরমোহনকে লইয়া ঢাকা আবদুল্লাপুর শ্রীনাথ সাধুর যজ্ঞ দেখিতে যান। যতীন্দ্রবর্দ্ধন (নিরঞ্জনানন্দ) * ও রমণীশঙ্কর দত্ত (কেশবানন্দ)† উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই কার্য্যে সাহায্য করিতেছিলেন, তাহারা দু'জনেও সঙ্গে চলিলেন ; রাধিকা বাবুর বাড়ীও আবদুল্লাপুরে। তাহার বাড়ীতে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ঠাকুরকে দেখিতে আসিল এবং তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

একদিন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। বৃদ্ধ নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিলেন "আপনি রাধিকার গুরু ?" ঠাকুর বলিলেন "আমি এখনও শিষ্যের উপযুক্ত হইতে পারি নাই, গুরু হইব কি করিয়া ?" বৃদ্ধ বলিলেন "শাস্ত্রে গুরুর যে সকল লক্ষণ আছে সমস্তই আপনাতে বিদ্যমান দেখিতেছি ; আপনি স্বীকার করিতেছেন না কেন ? আমি বুঝিয়াছি আপনিই প্রকৃত গুরুর উপযুক্ত।" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ "রাধিকা, তোর পা' দুখানি আমার বুকে দে ত" বলিয়া

* ত্রিপুরা জিলার বিট্‌ঘর গ্রামে জন্ম, শিলচর ফরেষ্ট্‌ আফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বয়স আনুমানিক ২৫।২৬ বৎসর।

† ময়মনসিংহ জিলার কাস্তুল গ্রামে বাসস্থান, বয়স আনুমানিক ৩০।৩২ বৎসর ; আব্‌কারী বিভাগে শিবসাগর নাজিরা ডিষ্টিলারীর সুপারভাইজার।

তাহার চরণ বুকে রাখিলেন। সকলে স্তম্ভিত হইল। বৃদ্ধ বলিলেন "এরূপ কাজ আপনার মত গুরুই করিতে পারেন—অন্যের পক্ষে ইহা কিছুতেই সম্ভবে না।"

মাঘীসপ্তমীর দিন ঠাকুরের সঙ্গে যতীন্দ্র বর্দ্ধনের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক-ক্ষণ আলাপ হইল। ঠাকুর বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতীত কিছুই হইবার নয়। আর আধ্যাত্মিক শক্তি একটা কল্পনার বিষয় নহে। এখনও ভারতে বহু শক্তিশালী মহাপুরুষ আছেন। যতীন্দ্রের কিন্তু ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না।

যতীন্দ্র। শোনা ত যায় অনেকই, কিন্তু দেখা যায় কৈ?

ঠাকুর। খুঁজিলে মানুষ অবশ্যই মিলে।

যতীন্দ্র। যথার্থ মহাপুরুষ পাইলে তাঁহার াশ্রয় লই, কিন্তু তেমন মহাপুরুষ আজ কাল কোথায়?

ঠাকুর। মহাপুরুষ সর্ব্বত্রই আছেন, রাস্ত. াটেও আছেন, এমন কি এখানেও থাকিতে পারেন।

যতীন্দ্র। শক্তি না দেখিলে বিশ্বাস কি?

ঠাকুর। একটি টিপা সহিবারই শক্তি নাই, আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে!

এই বলিয়া ঠাকুর তাহাকে স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ-মাত্র যতীন্দ্রের সমাধি হইয়া যায়—ঘণ্টাখানেক পরে চেতনা হয়। কয়েক দিন তাহার ভাবস্থ অবস্থায়ই গিয়াছিল। কীর্ত্তনে, এমন কি খাইতে শুইতে পর্য্যন্ত, তাহার ভাব হইয়া যাইত। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনিয়া প্রত্যহ দুই তিন শত স্ত্রী পুরুষ ঠাকুরকে দেখিতে আসিত। চারিদিকে রব

উঠিয়াছিল “ভারতী গোঁসাই নিমাইকে নিয়া আসিয়াছে।” তিন দিন ব্যাপিয়া শ্রীনাথ সাধুর যজ্ঞ হয়; যজ্ঞান্তে ঠাকুর হবিগঞ্জ চলিয়া যান। যাইবার সময় রাধিকা বাবুকে বলিয়া গেলেন “শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে তোমাকে আশ্রমে থাকিতে হইবে।”

এই বার হবিগঞ্জ হইতে বামৈ যাইবার পথে একটী পাগলের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। একটী টোলের ছাত্র তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। পাগল দূর হইতে বিষম উত্তেজিত স্বরে কাহাকে গালাগালি করিয়া আসিতেছে, শুনিয়াই তিনি সঙ্গীটাকে বলিলেন “এ কি বলে লক্ষ্য রাখিও।” পাগল বলিতেছিল “ঢাকা গিয়া কি কর্‌লে—গেলে যদি কিছু কর্‌লে না কেন? এখন পর্য্যন্তও বুট জুতা ছাড়া চলে না, চাকুরীর মায়া আজও ছাড়্‌তে পারলি না?” কাছে আসিলে ঠাকুর স্থিরদৃষ্টিতে—তাঁহার দিকে চাহিবামাত্রই সে দ্রুতবেগে পলাইয়া যায়। সঙ্গীটী পাগলের কথা শুনিয়া এবং ঠাকুরের কার্য্য দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় আর একটী মুসলমান পাগল ঠাকুরকে বলিয়াছিল “দুনিয়াটা কি ভাবে চল্‌ছে তার কি খবর রাখিস্ রে?” তিনি বলিলেন “আমি খবর রাখিলেই কি হইবে।” ঠাকুরের সঙ্গে তখন মুসলমানী ভাষায় পাগল অনেক তত্ত্ব কথা কহিয়াছিল। তাঁহার জীবনে নানাস্থানে অনেক পাগল অতি মূল্যবান কথা বলিয়াছে। তিনি বলেন “লোকে যাহাদের পাগল বলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ আছেন—পাগলামি তাঁহাদের একটা ছদ্মবেশ মাত্র।” অনেক স্থলে, তিনি পাগলের মুখ দিয়া এমন অনেক উচ্চ তত্ত্ব কথা বাহির করিয়াছেন, যাহা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছি। উৎসবের পর হইতে

স্বামী চিদানন্দ, ঠাকুরও আশ্রমের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন; ঠাকুরের কৃপায় অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার অতি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা ভাবে ডুবিয়া থাকিতেন। সর্ব্বদা "সোঽহং" "শিবোঽহং" বলিয়া সকলের সঙ্গে গোলমাল করিতেন। অনেক সময় কীর্ত্তনে আসিয়া বাধা দিতেন। দেখিলে পাগল বলিয়া মনে হইত। ঠাকুর পূর্ব্বেই রাধিকা বাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, চিদানন্দের সত্বরই একটা বিষম পরিবর্ত্তন হইবে। এবং তখন হবিগঞ্জের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া তাঁহাকে জানাইতে বলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রত্যেক ভক্তের সাধন বিষয়ে ঠাকুর কিরূপ দৃষ্টি রাখেন এবং কিরূপ অসীম সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের সমস্ত আব্দার ও অত্যাচার সহিয়া থাকেন, স্বামী চিদানন্দের লিখিত বিবরণ পাঠে তাহা অতি সুন্দর বুঝা যাইবে।

"......তিনি আমাকে ভগবানের নাম করিতে বলিয়া যান, এবং কি ভাবে করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া যান; কিন্তু আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তবে এই সময় মার প্রতি আমার একটা প্রবল আকর্ষণ হয়। আমি তাঁহারই বিকাশ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতাম। সবই যেন মা, এইরূপ মনে হইত। গাছ, লতা, মানুষ সমস্তই আনন্দময় বলিয়া বোধ হইত। অনেক সময় গাছ লতাদি ধরিয়া কাঁদিতাম। পাপ, পুণ্য এ সমস্ত কিছুই না বলিয়া মনে হইত। মা ই মনোরূপে সব চিন্তা করিতেছেন। যা কিছু দেখি—সবই মা। 'আমি' কোথায়! 'আমি তো তিনিই' এইরূপ ধারণা হইত। অনেক সময়েই কাঁদিতাম। যদি কেহ পাপ কিংবা অন্য কোনও বিষয়ের জন্য দুঃখ কষ্ট প্রকাশ করিত তবে প্রাণে বড়

আঘাত লাগিত। ভাবিতাম এরা কি অজ্ঞান, কিছুই বুঝে না। একদিন রাধিকা বাবুর বাসায় ভাবস্থ অবস্থায় তাঁহার স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকি এবং তিনি নিজ হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দেন এইরূপ আব্দার করি।...এই সময় ঠাকুরকে দেখিবার জন্য প্রাণে একটা প্রবল ইচ্ছা হয় এবং হবিগঞ্জ তাঁহার নিকট পত্র লিখিবার জন্য রাধিকা বাবুকে অনুরোধ করি। আমার এই সকল ভাব কোন শক্তিবলে হইতেছে, তাহা তখন বুঝিতাম না। ঠাকুর রাধিকা বাবুর পত্র পাইয়া আশ্রমে আসেন। আমরা সন্ধ্যার সময় আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম—সে দিন শিবচতুর্দ্দশী। আমি উপদেশানুযায়ী নাম করি কিনা, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম 'না, আমি তা তো কিছুই করি নাই, তবে অনেক সময়ে মা, মা বলিয়া ডাকিয়াছি' তিনি বলিলেন 'এই তো আর কি ?' তার পর আমার এই সমস্ত ভাবের কথা বলিলাম, এবং ইহা ভাল কি মন্দ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন 'বলিস্ কি ? এ অতি উচ্চ ভাব, এ যে সোঽহং ভাব।'"

রাত্রে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনে ঠাকুর, রাধিকা বাবু, গুরুদাস বাবু, গোবিন্দ বাবু, অখিল বাবু ও যতীন্দ্র বর্দ্ধন ছিলেন। সারা রাত্রি কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের মধ্যে ভাবাবস্থায় ঠাকুর আমাদের নিকট অনেক গুহ্য কথা বলিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাত হইতে আবার কীর্ত্তন চলিল। এই দিন রাত্রি প্রায় দেড়টার সময়, আমাকে মার ঘরে ডাকিয়া সাধন-সম্পর্কীয় অনেক উপদেশ দিলেন। তখন আমার বুকে হাত দিয়া বলিলেন 'তোর আর নিব কি ? তোর তো পাপ কিছুই নাই।" তারপর আবার আশ্রম-ঘরে গেলাম। কীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

পরদিন সকালে নয়টা কি সাড়ে নয়টার সময় যতীনকে নিয়া মার ঘরে বসিয়াছেন। মার ঘরের নিকট আমি যাইবা মাত্র আমাকে 'জয়কিশোর শুনে যা' বলিয়া ডাকিলেন। তাঁহার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে এক অসীম শক্তির সঞ্চার হইল। দেখিলাম যেন আমার 'আমিত্ব' সব লোপ হইয়া গিয়াছে এবং আমাতে এক আনন্দের হিল্লোল খেলিতেছে। যন্ত্রবৎ নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি করিতে লাগিলাম। যতীনের নিকট গিয়া বলিলাম 'দে তোর সব পাপপুণ্য আমাকে দে, অবিশ্বাস করিতেছিস্? আমি আর ঠাকুর এক গ্যাথ্।' এমন সময় ঠাকুর বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। 'গ্যাথ্ আমি আর ঠাকুর এক কি না?' এই কথা বলিয়া ঠাকুরকে টান দিয়া মার ঘরের মেজের উপর ফেলিয়া দিলাম। এবং তাঁহার বুকের উপর উঠিয়া দুই তিন লাফ দিলাম। তারপর তিনি আশ্রম ঘরে গেলেন, আমিও গেলাম। সেখানে যাইয়া অপরাপর যত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগকে বলিতে লাগিলাম 'আমি আর তোদের ঠাকুর এক। তোদের যা' পাপ তাপ আমাকে দিয়া দে' আর নীচের শ্লোকটী আওড়াইতে লাগিলাম:—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

গম্ভীর-রবে ঠাকুরও বলিতে লাগিলেন :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

আবার ঠাকুরের মাথার উপর উঠিয়া আরও কি কি বলিলাম।

হার পরেই আশ্রম-ঘর হইতে দৌড়াইয়া মণ্ডপে গিয়া...দিলাম। তারপর আরও কি কি করিলাম স্মরণ আসিতেছে না। এই দিন সকলে ান করিয়া আসিয়া মণ্ডপে একত্র হইলে পর ঠাকুর বলিলেন 'অদ্য ইতে আমাদের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইল।' "

এখানে বলা প্রয়োজন, ভক্তদের মধ্যে কেহ যথার্থই উচ্চ মঞ্চে আরূঢ় ইয়া কোনও কথা বলিলে, এমন কি তাঁহার নিজের শরীরের উপর ত্যাচার করিলেও, তিনি তাহা সহিয়া থাকেন। তখন 'তুমি' 'তুই' হা ইচ্ছা বলিয়া সম্বোধন করিলেও ক্ষতি নাই। বরং এরূপ স্থলে াবের অনুরূপ ক্রিয়া দেখিলেই তিনি বেশী সন্তুষ্ট। কিন্তু কৃত্রিমতা ়িনি একবারেই সহ্য করিতে পারেন না। এমন কি, কেহ কেহ ্রয়সম্বোধন করিয়া নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়াছেন। ই সব স্থানে প্রায়ই তিনি মুখে কিছু না বলিয়া কোনও ঘটনার ্য দিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিয়া থাকেন।

ইহার পর ঠাকুর আবার কিছুদিনের জন্য হবিগঞ্জ চলিয়া গেলেন। ই সময় তিনি গুরুদাস রাহাকে সঙ্গে নিয়া শ্বশুরালয় বনগ্রামে ়য়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় একটী অতি আশ্চর্য্য টনা ঘটিয়াছিল। "শ্রীশ্রীদয়ানন্দ লীলামৃত" গ্রন্থ হইতে রাহা মহাশয়ের লখিত বিবরণী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।"......(১৩১৫ বাংলার ৫শে ফাল্গুন) সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা বনগ্রাম হইতে বাঘজুরকান্দী াসিতেছিলাম; পথে একটী ছোট নদীতে খেয়া পার হইবার সময়, ামার সাইকেলটী খারাপ হইয়া পড়ায় আমরা উভয়েই হাঁটিয়া চলিতে াকি; দুজনে রাস্তার দু'পার্শ্ব দিয়া চলিতেছিলাম। ভাগবতের গোপী-

প্রেম সম্বন্ধে আলাপ হইতেছিল। পেছনে ফিরিয়া দেখি একটি লোক আমাদের অতি নিকটে। সে চলিয়া গেলে আমরা বেশ প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারি ভাবিতেছি, কিন্তু সে এমনি ভাবে আসিতে লাগিল যে আগেও যায় না, বেশী পাছেও পড়ে না; এক একবার আমাদের মাঝখানে আসিয়া পড়ে। লোকটী প্রাচীন বয়স্ক, পরিধানে একখানি জীর্ণ মলিন বস্ত্র। সে প্রায় আধ মাইল এই ভাবে আমাদের সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু কোনও কথা বলে নাই। আমরাও তদ্‌গত চিত্তে আলাপ করিতেছিলাম, তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। কেবল একটী লোক পেছনে আছে বুঝিতেছি মাত্র। আমাদের আলাপও প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় কি একটা জিনিষে ধাক্কা লাগিয়া ঠাকুরের সাইকেলটীতে টন্ টন্ করিয়া আওয়াজ হইল, কিসে এরূপ আওয়াজ হইল ভাবিয়া আমরা সাইকেলের দিকে চাহিতেছি, এমন সময় সে লোকটী দুজনের মাঝে আসয়া দাঁড়াইল, কিন্তু যাই আমরা মাথা নোয়াইয়া সাইকেলটী পরীক্ষা কবিতে যাইতেছি, অমনি, সে লোকটী চক্ষের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রকাশ্য রাস্তা—বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়; এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রার্পিতবৎ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে ঠাকুর আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন "দেখুন, ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! যেখানে ভাগবত, যেখানে তাঁর লীলা কীর্ত্তন হয়, ভগবান সেই খানেই সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, আজ তিনি তাহারই জলন্ত প্রমাণ দিয়া গেলেন।"

হবিগঞ্জ যাইবার সময় ঠাকুর বলিয়া গিয়াছিলেন কীর্ত্তন যেন কিছুতেই বন্ধ না হয়। এই সময় হইতে ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোবিন্দ

বাবুর বাসায় একত্র হইয়া কীর্ত্তন করিতেন। গোবিন্দ বাবুর স্ত্রীর প্রায়ই ভাব হইত। অনেক সময় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতেন। রাধিকা বাবু এবং স্বামী চিদানন্দ তখন অতি কঠোর সাধনা করিতেন। প্রথমে দুজনে শিলচরে থাকিয়া একত্রেই সাধনা করিয়াছিলেন; পরে স্বামী চিদানন্দ আশ্রমে চলিয়া যান এবং মৌনব্রত অবলম্বনে দিবসের অধিকাংশ সময়ই সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। রাধিকা বাবুও প্রত্যহ প্রায় আঠার ঘণ্টাকাল সাধনা করিতেন। কীর্ত্তনে তাঁহার প্রায়ই ভাব হইত। অনেক সময় শক্তির ক্রিয়াও হইত। কখন কখন এমন অবস্থা হইত যে, শরীরে আর শক্তি ধরে না; দেহটাকে সম্বরণ করাই অসাধ্য হইয়া উঠিত।

আষাঢ় মাসের শেষে ঠাকুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে, ভক্তগণও সেইখানে উপস্থিত হইলেন। কয়েকটী মহিলাও সেইবার আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখানে আবার আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। সকলে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল। সেই দিন ঠাকুর মার ঘরে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলে ভগবানের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হও, যখন শক্তির প্রয়োজন হইবে মার কাছে চাহিলেই দিবেন।" ইত্যাদি।

উৎসবের অব্যবহিত পরেই একজন মহাপুরুষ আসিয়া গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন "মার নাম কি রাখিলি?" তিনি বলিলেন "আনন্দময়ী"। "আর সন্তানদের কোনও নাম রাখিলি না?" এই বলিয়া তিনি সেবকদের নামকরণ করিয়া যান এবং ভবিষ্যতেও দীক্ষার সময় নামের শেষে 'আনন্দ' কথাটী রাখিতে হইবে আদেশ দিয়া গেলেন। ঠাকুরের "দয়ানন্দ" নামও এই সময় হইতে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

গোবিন্দ বাবুর বাসায় কীর্ত্তন রীতিমত চলিতে লাগিল। এক দুইটী করিয়া নূতন লোক আসিয়া ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। দিন দিন ঠাকুর ও আশ্রমের প্রতিপত্তি বাড়িতে চলিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একদল বিরুদ্ধাচারী শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। "এই সে দিনকার গুরুদাস চৌধুরী, সে আজ 'দয়ানন্দ স্বামী' হইয়া গেল; এত লোকে তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে, ইহাও কি প্রাণে সহ্য হয়?" কত অভিযোগ আসিতে লাগিল।

কতপ্রকার সমালোচনা চলিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। পরের কুৎসা প্রচার এবং অলস সমালোচনা, এ না থাকিলে একটা অধঃপতিত জাতির নীরস জীবন দুর্ব্বহ হইত। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-পত্রে লিখা হইয়াছিল "এই আশ্রম ধর্ম্মপ্রাণ যে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত সরল বিশ্বাসী ধর্ম্মীর নিকট চির উন্মুক্ত থাকিবে; সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ই আশ্রমের উদ্দেশ্য।" ধুয়া উঠিল, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় আর কিছু নহে—সব একাকার করিবার চেষ্টা, জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা, তা' না হইলে আশ্রমে মুসলমান আসে কেন? ভৈরবীর ঘটনার পর হইতে অনেকে অভিযোগ করিতে লাগিলেন 'এরা মদ খায়।' কাহারও কাহারও আশঙ্কা হইতে লাগিল 'আশ্রম স্বদেশীর একটা আড্ডা, ইহার কোনও গুপ্ত রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে।' যাঁহাদের ছেলেপেলে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিতে লাগিল, তাঁহারা কাজে কাজেই আশ্রমের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন।— ঠাকুরের সঙ্গে আসিয়া অনেকের মালা তিলকের ঘটা কমিয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক পাঁচ মিনিট ভগবানের নাম করিব, আর তিলক কাটিতে এক ঘণ্টা যাইবে ইহা তাঁহার নিকট বড়ই বিসদৃশ মনে হইত। এই নিয়াও

াজারের লোকদের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। গোবিন্দ াবুর বাসায় কীর্ত্তন হয়, ইহাও অনেকের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল— হাতে তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে। কেহ কেহ ডেপুটী কমি· নারের নিকট দরখাস্ত দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঠাকুর কিন্তু কিছু- তই বিচলিত হইবার নহেন, তিনি হাসিয়াই সব উড়াইয়া দিতে াগিলেন। সকলকে বলিয়া দিলেন "এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলে াামাদের কাজ চলিবে না। যাহা সত্য বুঝি, তাহা করিয়া যাই। কে াল বলে, কে মন্দ বলে সে দিকে দৃক্পাত করিব না," তুলসীদাস লিয়াছেন—

"হাত্তী চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুন্ কো দুর্ভাব নহি যঁও নিন্দে সংসার॥"

াার একদিন বলিয়াছেন "ইহাদের এইটুকু ই সহ্য হইতেছে না। এমন ান আসিতেছে যখন, আমার জন্য লোকে ঘুমাইতে পারিবে না। াত্রে বাতি জ্বালিয়া আমার ও আশ্রমের কথা ভাবিতে হইবে।"

লোকনিন্দায় তিনি কিরূপ উদাসীন—তাঁহার এই সময়ে রচিত একটী গীতের "আমি লোকনিন্দা পুষ্পচন্দন সার করি যে অনিবার" াই পদটী হইতেই প্রতীয়মান হইবে। প্রণবানন্দের * (ডাক্তার রেন্দ্রনাথ দত্ত) নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

* ময়মনসিংহ জিলার কাস্তুল গ্রাম ইহার জন্মস্থান; ইনি শিলচরের একজন প্রসিদ্ধ াক্তার, বয়স ৫০ বৎসর; প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ শিলচর ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পর্কিত লেন।

"লোকনিন্দা উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবান সময় বুঝিয়া কোনও কোনও ঘট দ্বারা এ সমস্ত নিন্দার সৃষ্টি করেন।.........এক তুমিই অনেক তাহারা হইয়াছ।"

আশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের পূর্ব্বেই নানা স্থানের অনেক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার ভক্তশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে কীর্ত্তনানন্দ* (সুরেন্দ্রনাথ বসু) প্রভৃতি অনেকেই পূর্ব্বে বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। দ্বিতীয় উৎসবের বিবরণ "লীলামৃত" গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

"......উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। নানা স্থান হইতে অনেক সাধু মহাত্মা আসিলেন। অন্যূন দশ বারো সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আনন্দ কোলাহলে ও অবিরাম সংকীর্ত্তনের মধুর মন্দ্রে মা আনন্দময়ীর বিজন শৈলপুরী মুখরিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সুবিখ্যাত নকুল সাধু ও আসিয়াছিলেন। নকুলের ভক্তি-রসাপ্লুত-মধুব-মূর্ত্তি ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে পারদর্শিতা দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হরিনাম শ্রবণে তাঁহার অরুণনয়নে অশ্রু ঝরে, অঙ্গে পুলক কম্প প্রকাশ পায়, নকুল প্রেমাবেশে ধূলায় লুটায়। হেনাপত্রের শ্যামল বর্ণের ভিতর যেমন রক্ত-রাগ প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি তাহার স্নিগ্ধ-শ্যাম দেহের মধ্যে একটি রুদ্রাগ্নি শিখা লুক্কায়িত আছে। ধর্ম্মদ্বেষী ভক্তদেষীদের উপর মাঝে মাঝে সে আগুন ছুটিয়া পড়ে। তখন তাঁহার শরীরে মহাশক্তি সঞ্চারিত হয়,

* যশোহর জিলার সিদ্ধিপাশা গ্রামে জন্ম, বয়স আনুমানিক ৪০ বৎসর, রেলওয়ে-মেল-সার্ভিসে চাকুরী করিতেছেন।

সে সিংহনাদে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান করে। এ অবস্থায় এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইতে সাহসী হয় নাই। তাঁহার প্রতি সকলে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু নকুল বহুগুণের আধার হইলেও সাম্প্রদায়িকতার লেশ হইতে মুক্ত ছিলেন না। একটী ঘটনায় তাঁহার এই ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। মার ভোগের ঘণ্টা বাজিল—সকলে প্রসাদ পাইতে চলিলেন—নকুলও সঙ্গে গেলেন। সকলে প্রসাদ লইলেন। নকুল পরম বৈষ্ণব—তিনি মহা-সমস্যায় পড়িলেন—কালী মার প্রসাদ গ্রহণ করেন কি করিয়া? তিনি প্রসাদ হাতে লইয়া অন্যের অসাক্ষাতে নিম্নে অবতরণ করিয়া একটী বৃক্ষমূলে পত্রোপরি রাখিয়া আসিলেন। এ কথা ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। সভা-মধ্যে আসিয়া নকুল কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন—যখন তাঁহার রুদ্র ভাব উদ্দীপ্ত হয়, দেহে শক্তি জাগ্রত হয়, তখন তাঁহার প্রতিরোধ করে কার সাধ্য! স্থানে স্থানে কত বলিষ্ঠ লোক তাঁহার কাছে পরাজয় মানিয়াছে। ঠাকুর নকুলের পৌরুষ বাক্য শ্রবণে, ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন 'তোমাদের মধ্যে কি কেহ নকুলের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছ?' সকলে নিরুত্তর রহিলেন। এমন সময় ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধী সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়কে (স্বামী হংসানন্দ)* আদেশ করিলেন 'সুরেন্দ্র রায়, আজ তোমাকে নকুলের সহিত লড়িতে হইবে।' সুরেন্দ্র রায় মাত্র ৭।৮ দিন পূর্ব্বে আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি

* ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সুবন্ধি গ্রামে ইঁহার জন্ম, বয়স অনুমান ২২।২৩ বৎসর; ইনি সম্প্রতি শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার স্থানে স্থানে নামপ্রচারে বাহির হইয়া যে অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত করিতেছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ "স্বামী হংসানন্দের প্রচার বিবরণী"তে দ্রষ্টব্য।

প্রস্তুত হইলেন। নকুল তাঁহার সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। 'তুমি ব্রাহ্মণকুমার, তোমার মহাবিপদ ঘটিবে, এ কার্য্য হইতে নিরস্ত হও' বলিয়া নকুল বার বার তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু সুরেন্দ্র রায় পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন; তিনি ঠাকুরের আদেশ পাইয়াছেন; নববলে বলীয়ান হইয়া নকুলের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বার বার তিনবার সুরেন্দ্র রায় নকুলকে ধরাশায়ী করিলেন—সভাস্থ সকলে বিস্মিত—অবাক্। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল। নকুল ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ লাঞ্ছিত হন নাই। আজ কোনও গুরুতর অপরাধে তাঁহার দেহে শক্তি জাগ্রত হয় নাই মনে করিয়া, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বুঝিতে পারিলেন, মার প্রসাদ অবমাননাই তাঁহার এই লাঞ্ছনার কারণ।

তাঁহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে মনে করিয়া ঠাকুর মধুর-হাস্যে—মিষ্ট বচনে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তিনি নকুলকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। শক্তি জাগ্রত হইলে তিনি অপরাজেয়—নিজেও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; আরও বহুবার তাঁহার রুদ্র-গর্জ্জন শুনিয়াছেন; কিন্তু তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হন নাই। সেদিন কেন সুরেন্দ্র রায়ের প্রতি এরূপ আদেশ করিলেন তাহার প্রকৃত রহস্য অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারিয়াছেন।"

১৩১৬ বাংলার মাঘ মাসে কুমিল্লায় জনৈক বন্ধুর নিকট ঠাকুর ও অরুণাচলের কথা প্রথম শুনিলাম। শুনিয়াই আশ্রম-দর্শনের জন্য প্রাণে কেমন একটা পিপাসা জাগিল। নগেন্দ্রকে বলিলাম ঘরের কাছে এমন সুন্দর একটী কাজ হইয়া যাইতেছে—আর আমরা ইহার

বের রাখি না—বড়ই লজ্জার কথা। তাহার নিকট ইহাও শুনিলাম যে, প্রতিষ্ঠাতা তাহারই একজন সহাধ্যায়ী। সৌভাগ্যক্রমে ঐ মাঘ মাসেই উভয়ে অরুণাচলে ঠাকুরের দর্শন লাভ করি। প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে হবিগঞ্জে এক দিন আমাদিগকে দেখিয়া ঠাকুর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহা সত্যানন্দের লিখিত আত্মবিবৃতি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"১৩১৫ বাংলার কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে ঠাকুরের সঙ্গে আমি হবিগঞ্জ গিয়াছিলাম। একদিন আমি ও ঠাকুর তাঁহার বাসার সাম্‌নের পুকুরে স্নান করিতেছি—এমন সময় মহেন্দ্র বাবু ও নগেন্দ্র বাবু কতকগুলি ছাত্র সহ ন্যাশনেল্ স্কুলে যাইতেছিলেন। ঠাকুর মহেন্দ্র বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন 'এই যে ছেলেটীর মত একটী লোক দেখিতেছ—ইহার নাম মহেন্দ্র বাবু; ইনি এম, এ, বি, এস-সি। ইহার Heart (অন্তঃকরণ) ....নগেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিলেন। পরে বলিলেন ইহারা একদিন আমাদের লোক হইবে।"

এই সময় হবিগঞ্জ হইতে 'মৈত্রী' নামক একখানি মাসিক ও 'প্রজাশক্তি' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইত। শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ উভয় পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন। মৈত্রীর অধিকাংশ প্রবন্ধ আমরা দুজনেই লিখিতাম। ইহার মূলমন্ত্র ছিল "ভূমৈব সুখং—নাল্পে সুখমস্তি" ইহাতে উদার সর্ব্বজনীন ভাবে সমস্ত জগৎ-সমস্যার আলোচনা হইত। আর সনাতন ধর্ম্মের একটী বিরাট অভ্যুত্থানের যুগ—সমগ্র জগতে একটী মহা ভ্রাতৃত্বের যুগ—একটী বিরাট সমন্বয়ের যুগ সম্মুখে—ইহাও আমরা ঘোষণা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ

ঘোষের "ধর্ম্ম" কাগজে "যোগ ও ধর্ম্ম" বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িয়া তখন বহুলোকের প্রাণে একটী পিপাসা জাগিয়াছে। যোগশক্তি যে একটী কল্পনার বিষয় নয়, আমাদের এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আষাঢ় ও শ্রাবণের মৈত্রীতে আমাদের আত্মীয় একটী তরুণ যুবক তাহার যোগ সাধনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। ইহাতে এমন সব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনানিচয়ের সমাবেশ ছিল যে, শত শত লোকের মনে সাধনার জন্য একটী তীব্র পিপাসা জন্মিয়াছিল। তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন—"নব শক্তি লাভ করিয়া শীঘ্রই একদল বাঙ্গালী সন্ন্যাসী জাগিবে। বহু বাঙ্গালী যুবক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে। সাধনা ও সিদ্ধির যুগ সম্মুখে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়াছে। ঐ বাঁশীর রবে বহুলোক পাগল হইয়া ছুটিয়া যাইবে। বাঙ্গালী জাগিতেছে—ভারতকে জাগাইবার জন্য। ভারত জাগিবে সমুদয় জগতে ধর্ম্মের রাজ্য—শান্তির রাজ্য—প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য।......পৃথিবীর শৈশবে জড়শক্তির কাল গিয়াছে—তার পর পশুশক্তির কাল গিয়াছে—এখন বুদ্ধিশক্তির কাল আসিয়াছে, এবং সম্মুখে প্রেমশক্তির যুগ আসিতেছে। আবার জগতে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে।"

আষাঢ়ের "মৈত্রী"তে "নব ভারতের বার্ত্তা" শীর্ষক একটী কবিতায় ছিল :—

"মোর শ্রীকৃষ্ণের চরণ হইতে
ছুটিয়া হরষে
অই আসে এক অমৃত-বন্যা
ভারতবরষে।

* * *

ওগো বিশ্ববাসী আসিতেছি মোরা
ভয় নাহি আর।
জগতের মাঝে করিব মহান্
সত্যের প্রচার॥

শান্তির সলিলে দিবরে ধুইয়া
রক্ত রণস্থল।
প্রেম মন্দাকিনী বহাব জগতে
পুলকে চঞ্চল।

* * *

সুপ্ত নারায়ণ জাগিছেন আজ
প্রতি হিয়া মাঝে।
লুপ্ত হয়ে যাবে ভেদ বিসম্বাদ
মানব-সমাজে॥"

কয়েকমাস মধ্যেই আমার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ও নানা বিশৃঙ্খলা বশতঃ মৈত্রী উঠিয়া যায়।

"প্রজাশক্তি" প্রথমাবধিই সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণীর মুখপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তায় নহে—সনাতন সত্যের দিক্ দিয়া, প্রাণস্পর্শী ভাষায় একটা বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্রের ভাব প্রচার করা হইতেছিল। এত উচ্চ মঞ্চ হইতে লেখা হইত যে, শিক্ষাভিমানী লোকদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই সে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে

পারিতেন। এক খানি স্থানীয় পত্রিকায় "ডান হাত ও বাম হাত" শীর্ষক একটী পরিহাস পূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হয়। ইহার উত্তরে শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ লেখেন :—

"কেবা বাম, কেবা ডাইন? কেবা ছোট কেবা বড়? সকলেরই মাঝেত ভাই একই ভগবান বিরাজিত! যে এ কথা বিশ্বাস করিতে না পারে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার তাহার অধিকার নাই। পূর্ব্ব-পিতামহগণ বুদ্ধকে ভগবান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—চার্ব্বাককে শঙ্করের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! আর তাঁহাদেরই সন্তান আমরা—কোথায় প্রেম ও উদারতায় বিশ্ব আপ্লুত করিয়া ক্রমোন্নতি দেখাইব না, তাহা না করিয়া—সনাতন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া—আপন অঙ্গের অঙ্গ, আপন রক্তের রক্ত, আমাদের দেশের ভাই সকলকে—প্রাণের ভাই সকলকে, অস্পৃশ্য করিয়া—পশুবৎ করিয়া রাখিয়াছি। আর যদি তাহাদের ভিতর ভগবান জাগ্রত হন দেখি তবে, তাহাদিগকে উপ-হাস ও বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিতেছি।

ভাই সকল! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তোমরা কাহার অবমাননা করিতেছ? তোমরা যে ভগবানকে উপহাস করিতেছ—সমস্ত জগন্ময় এক মহা ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য-সংস্থাপনের জন্য ভগবান যে প্রয়াস করিতেছেন, তোমরা যে তাঁহার বিদ্রূপ করিতেছ! তোমরা দেবদ্বেষী—আত্মদ্রোহী; তোমরা অন্ধকারের মিত্র—আলোকের অরি! তোমরা কি আজও গৃহে গৃহে অন্ধকার দেখিতে চাও? ভগবানের সেরূপ ইচ্ছা নয়। নূতন আলোক লইয়া—নূতন আনন্দ লইয়া নবযুগ আসিয়া পড়িয়াছে। গৃহে গৃহে প্রেমের প্রবাহ বহিবে। আঁধারপুঞ্জে আলোকের

ঢেউ খেলিবে! তোমাদের ক্ষীণ প্রতিরোধ, ক্ষিপ্ত সাগরে বালির বাঁধের মত কোথায় ভাসিয়া যাইবে।..................ভারতবাসীকে আর ক্ষুদ্র হইয়া থাকিলে চলিবে না। গঙ্গাতীরবাসীগণকে এক বিরাট—উদার সভ্যতা জগৎবাসীকে বিতরণের জন্য চারিদিকে ছুটিতে হইবে! বৌদ্ধ যুগের কাণ্ড ত তার কাছে ছেলে খেলা!

.........ঐ যে মহা চীনের চা ক্ষেত্র হইতে চৈন কৃষক গৃহে ফিরিতেছে, ভারত সন্তান তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ ভ্রাতৃ-প্রেমে প্লাবিত করিয়া দিবে। তার পর ছুটিবে—ক্রমাগত ছুটিবে। সে প্রেমে জাপানের সামুরাই তরবারি ভাঙ্গিয়া হলফলক নির্ম্মাণ করিবে। জর্ম্মনীর ক্রুপের অস্ত্রনির্ম্মাণাগার মিলনমন্দিরে পরিণত হইবে। ফরাসী 'লা মার্শেল' ছাড়িয়া, বিশ্ব প্রেমের গান ধরিবে। কোকিল ডাকিতেছে—আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। এখন কি ভ্রাতৃরুধির বর্ষণে হিংসাবৃত্তি পরিতৃপ্তির সময়?

চাঁদের নূতন ভাষা—কোকিলকূজিতকুঞ্জের নবীন গীতা ভারত-সন্তান প্রচার করিবে। হে ভারতসন্তান! হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া পোষণ করা তোমার পক্ষে ধর্ম্মবিগর্হিত—জাতীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ প্রতিকূল।......

—তাই বলি ভাই—ডান-হাত, বাঁ-হাত, এ সব পাঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন, মলিন—সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া মানুষ হইতে চেষ্টা কর। জানিও, স্বচ্ছ মুকুরেই আত্মদর্শন সম্ভবপর! প্রাণকে নির্ম্মল করিতে না পারিলে, তোমরা যে তিমিরে আছ, চিরকাল সে তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে। নবীন উষার অমৃতসিক্ত রক্ত-রশ্মি বৃথাই তোমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইবে; তোমরা দেশের কাজে লাগিবে না—দশের কাজে

লাগিবে না; পুরাতন, অব্যবহার্য্য, কালের অনুপযোগী পদার্থের মত, এক কোণে পড়িয়া থাকিবে।.........সেই প্রাচীন ঋষির পবিত্র, উন্নত, উদার আদর্শ সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইলেই, তোমরা প্রকৃত আর্য্যসন্তান হইতে পারিবে।

"মাতা চ পার্ব্বতী গৌরী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবন ত্রয়ম্॥"

আমি তখন ভগ্নস্বাস্থ্যে কয়েক মাসের ছুটী নিয়া শ্রীহট্ট গিয়াছি। আমার জীবনে একটী গাঢ় বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রাণের কথা কেউ বোঝে না—আমরা যে ভাষায় কথা কই, এদের কাছে যেন অজানা ভাষা! ভগ্নস্বাস্থ্যে আমি অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছি। প্রাণে অসহ্য বেদনা! এক একবার প্রাণের দেবতাকে ডাকিয়া বলি "ওগো, সাগর-প্রমাণ পিপাসা যদি দিয়াছিলে—পিপাসা মিটাইবার স্থান কেন করিয়া রাখিলে না?" আর এক একবার প্রাণে অসীম প্রেরণা আসে, মনে হয় শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সেই কথা, সেই মন্ত্র প্রচার করিয়া যাইব। এক দিন না একদিন কোনও ভাবুকের প্রাণে, তাহার প্রতিধ্বনি উঠিবে। জানিতাম না, পিপাসা যিনি দিয়াছিলেন, পিপাসা মিটাইবার স্থানও তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীহট্ট হইতে লিখিয়া পাঠাইলাম:—"ওগো তোমরা কি বুঝিবে? আমি যে প্রাণের ভিতর একটী আগ্নেয়-গিরি, অতি কষ্টে, সংগোপনে রাখিয়াছি—মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিতেছি। অসহায় আমি—পর্ব্বত-প্রমাণ বিঘ্নের সাথে একাকী যুঝিতেছি।.........শত শত ব্যর্থ প্রয়াসের পশ্চাতে ঐ যে

তরঙ্গায়িত মহা-জলধি ভীম গর্জ্জনে আসিতেছে—আমি তাহা দূর হইতে দেখিতেছি। আমার প্রাণ অপার আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে—শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন মন্ত্র জপিতেছি "ভূমৈব সুখং—নাল্পে সুখমস্তি।"

৩রা মাঘের প্রজাশক্তিতে নগেন্দ্রের প্রথম "অরুণাচল" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরা তখনও আশ্রম দেখি নাই। প্রবন্ধে লিখিয়াছিল—"এই যুবক সন্ন্যাসীর মন্মথ-মনোহর মূর্ত্তি এখনও মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।"

"সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টের এক মহাপুরুষ—ভগবান শ্রীচৈতন্য, এমনি বয়সে, এমনি লাবণ্যময় দেহে, গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছিলেন। আজ বিংশ-শতাব্দীর মুখে আমাদের অরুণাচলের প্রতিষ্ঠাতাও—ভোগবিলাস, লালসা, অর্থ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ......আর্য্য-ধর্ম্ম আবার জাগিয়া উঠিতেছে; সনাতন-ধর্ম্মের নববিকাশের আশারঞ্জিত রক্তলেখা—প্রাচীমূলে সন্দর্শন করিতেছি।..... অরুণাচলের "দয়ানন্দ" এই অল্পকাল মধ্যে যে বিরাট ব্যাপারের সংঘটন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি।.... ..অরুণাচল শ্রীহট্টের—সমস্ত বঙ্গের গৌরবের স্থল হইয়া উঠিয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মাঘ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঠাকুরের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

সেই দিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঠাকুর, আমাদের দুইজনকে নিয়া টিলাইন পাহাড়ে বেড়াইতে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে

আলাপ চলিল। আজকাল লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া যাইতেছে, ইহাতে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"হায়, হায়, আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চলিয়াছি—প্রকৃত পথ ভুলিয়া গিয়াছি।"

সহসা অতি গম্ভীর-স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা বলুন দেখি, আপনার জীবনের লক্ষ্য কি ?" আমি বলিলাম "সত্য কথা বলিতে কি, আমার জীবনের লক্ষ্য কি, তাহাই জানিতে অরুণাচলে আসিয়াছি। যখন আসিতেছিলাম, তখনই আমার প্রাণ বলিতেছিল—এখানে গেলেই তোমার জীবনের লক্ষ্য কি জানিতে পারিবে।"

কিন্তু জীবনের লক্ষ্য কি, সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে না পারা, বড়ই লজ্জার কথা। আমি আবেগপূর্ণ স্বরে, আমার জীবনের লক্ষ্য কি বুঝাইয়া বলিলাম। আমার কথার সার-মর্ম্ম এই—পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পর, সমগ্র জগৎ যাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, এরূপ লোক জন্মেন নাই বলিলেও কিছুমাত্র দোষ হয় না। পূর্ব্ববঙ্গের এ অভাব আমি পূর্ণ করিব। সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে একটী জীবনস্রোত প্রবাহিত করিব। আপাততঃ ইহাই আমার লক্ষ্য। ঠাকুর ধ্যানস্থ হইয়া আমার কথা শুনিতেছিলেন—শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। আমার বক্তব্য শেষ হইলে, গম্ভীর-স্বরে বলিলেন "এ অতি ক্ষুদ্র লক্ষ্য!" আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। এমন ভাবে, এমন কথা বলিতে পারেন—এইরূপ ব্যক্তি একটীও আমার চোখে পড়ে নাই। সেই একটী মাত্র কথায় আমার হৃদয় জয় হইল। আমি বুঝিলাম এই পুরুষ-সিংহের নিকট একদিন সমগ্র দেশ মস্তক অবনত করিবে। ঠাকুর

আমাকে উপদেশ দিলেন "জগৎকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দানই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।"

পরদিন ঠাকুরের সঙ্গে আমরা শিলচর বেড়াইতে আসিলাম। সুরেন্দ্রনাথ বসুর (কীর্তনানন্দ) বাসায় সমস্ত ভক্তবৃন্দ সমবেত হইলেন। "প্রেমের নূতন হাট বসেছে নদীয়ায়" গানটী এখানেই প্রথম শুনিয়াছিলাম। গানটীর আমরা একটী নূতন সার্থকতা দেখিলাম। ভক্তদের পরস্পরে এমন অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব—ঠাকুরের সঙ্গে ইহাদের এমনি মধুর সম্পর্ক; মনে হইল এখানে যথার্থই একটী প্রেমের হাট বসিয়াছে। আমরা এতদিন যে সমস্ত সুখ-স্বপ্নের মধ্যে নিজের প্রাণকে পুলকিত করিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুর আমাদের দুজনকে সঙ্গে লইয়া রাধিকা বাবুর ঘরে আসিলেন। কথা-প্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে বলিলাম "মহাশয়, আপনার নাম দয়ানন্দ—আপনি দেশময় একটী প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করুন।"·········এইরূপ একটী দিব্য-কান্তি ব্রাহ্মণ কুমার, "জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দেশে দেশে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন—বহুদিন হইতে কল্পনা-নেত্রে এই চিত্রটী দেখিয়া আসিতেছি" এ কথাও তাঁহাকে বলিলাম। ঠাকুরের চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। আকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে, তিনি সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম—"দয়ানন্দ" নাম নিরর্থক হয় নাই।

সেই রাত্রের ট্রেণেই ঠাকুর হবিগঞ্জ রওয়ানা হইলেন। আমরাও সঙ্গে চলিলাম; কার্য্যোপলক্ষে আমরা করিমগঞ্জ নামিলাম। সহর হইতে ষ্টেশনে যাইবার সময় পথে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল; ইহাতেই

আমার জীবনের স্রোত ফিরিয়া যায়। যাইতে যাইতে, হঠাৎ তিনি একবার আমার পৃষ্ঠে হাত দিলেন। নগেন্দ্র বলিল 'মহাপুরুষেরা নাকি স্পর্শ-মাত্রই লোকের মনে ভক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। ইনি জ্ঞান-প্রধান—ইহার মধ্যে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, তবে বুঝি আপনার কেমন শক্তি।"

ঠাকুর (সহাস্যে)—মহাপুরুষেরা পারেন, কিন্তু আমরা তো আর মহাপুরুষ নই।

আমি (পরিহাসচ্ছলে)—আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে আপনি মহাপুরুষ নহেন। আপনার স্পর্শে কিছুই হইবে না।

ঠাকুর (মৃদুহাস্যে)—তাঁর ইচ্ছা হইলে কি না হইতে পারে। তাঁর ইচ্ছা হইলে আমাদের স্পর্শেও হইতে পারে।

এইকথা বলিয়াই নিমেষ-মধ্যে হাত খানি সরাইয়া লইলেন।

বাস্তবিক, কোনও কথার পাছে "তাঁর ইচ্ছা হইলে" কথাটা থাকিলে, কি আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়া যায়। জীবন সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করে—প্রাণে অসীম বল আসে।

ট্রেণে আমি মনে মনে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—"আমাদের পক্ষে কিরূপ সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন।" তাঁহার একটী সঙ্গীকেও একথা বলিয়া রাখিয়াছিলাম। ঠাকুর যেরূপ ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্য্যামীত্ব সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না।

করিমগঞ্জ নামিয়া যাওয়ার পর হইতে, আমার মনে কিরূপ ভাব আসিল—ভাষায় তাহার বর্ণনা করা চলে না। এই দুইটী দিন যেন একটী স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের চোখের উপর যেন

একটী নূতন আকাশ খুলিয়া গিয়াছে। আর মনে হইতে লাগিল—সেই প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসী যেন দূরে থাকিয়া প্রবল আকর্ষণে আমাকে টানিতেছেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় করিমগঞ্জের কোনও ভদ্রলোকের বাসায় নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছি। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার শ্বাস এমন কি আমার দেহটী পর্য্যন্ত, কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শরীরে কিন্তু কিছুমাত্র অসু বোধ নাই। আমি প্রাণপণে শ্বাস টানিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আর বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল—দাঁড়াইয়া পাদচারণা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ আর দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। তখন একখানি বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সঙ্গীরা আমার অবস্থা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, আমার মাথা ধরিয়াছে, কিম্বা অন্য কোনও অসুখ করিয়াছে। নগেন্দ্র আমার মাথায় হাত দিল, পরীক্ষা কারয়া দেখিল মাথা শীতল—অসুখের চিহ্ন মাত্রও নাই। আমার রীতিমত জ্ঞান আছে, তাহাদের কার্য্য দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছি। নগেন্দ্রকে বলিতে গেলাম "তোমরা কোনও চিন্তা করিবে না, আমার কোনও অসুখ করে নাই, আমি বেশ আছি।" সহসা বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত হইল। হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতে গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হাতনাড়া তো দূরের কথা—হাত আছে কি না সন্দেহ। লিখিতে যতক্ষণ লাগিল, ঘটনাটীতে তাহার শতাংশের একাংশ সময়ও লাগে নাই। মনে হইল যেন, কোনও মায়াবী আমাকে লইয়া খেলা করিতেছে; আর আমার এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছে। আমিও মনে মনে

হাসিতে লাগিলাম। ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই লোপ পাইতে লাগিল। কিন্তু জ্ঞান আছে—আর দেহের ভিতর দিয়া একটী আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছে। খানিক পরেই খাইতে যাইবার ডাক পড়িল। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কষ্টে-সৃষ্টে যাইয়া খাইতে বসিলাম। একটু পরে চিন্তা আসিল—এরা এত কথা বলিতেছেন, আমি এর কিছুই শুনিতেছি না। এবার মনোযোগ দিয়া সকলের কথা শুনিতে চেষ্টা করিলাম। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! প্রত্যেকটী শব্দ শুনিতেছি এবং বুঝিতেছি; কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটী শুনিবা মাত্র আগের কথাটী স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া যাইতেছে। খাওয়া দাওয়ার পর, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। প্রাণে অপার্থিব আনন্দ! সে আনন্দ দেহে ধরে না। পথে যাহাকে পাই, তাহাকেই কোল দিতে ইচ্ছা হয়। জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী; অমৃত সাগরে জোয়ার আসিয়াছে—অন্তরে বাহিরে পূর্ণিমা।

পরদিন হইতে একেবারে পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাব। কত লোকে কত কথা বলিতেছে, কিছুতেই মন বিচলিত হইতেছে না। আনন্দের স্রোতেও ভাটা পড়িতেছে, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি নাই। ক্রমে সে ভাবও চলিয়া গেল। কেবল সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দুই একদিন পরে হবিগঞ্জে যাইয়া দেখা পাইলাম। নানা কথাবার্ত্তা হইল। প্রত্যেক কথায় তাঁহার চিন্তার সাহসিকতা, গম্ভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইলাম। দেখিলাম তাঁহার মত এবং জীবনে একটী পূর্ণতা আছে। এই যুগের উপযোগী একটা সমন্বয়ের ভাব আছে।

অনেক কথাবার্ত্তার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার জীবনের Mission (কার্য্য) কি, তাহা কি আপনি জানেন ?"

ঠাকুর—জানি বই কি !

আমি—পূর্ণ জ্ঞান আছে ?

এ বড় শক্ত প্রশ্ন—মনে হইল যেন তিনি একটু ফাঁপরে পাড়লেন। বলিলেন—"তাই বা বলি কি করিয়া ?"

আমি—আপনি কি লোকের মনের কথা বুঝিতে পারেন ?

ঠাকুর এই প্রশ্ন শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন—বলিলেন "কিছু কিছু পারি বই কি ? আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পর হইতে, ট্রেণে করিমগঞ্জ পর্য্যন্ত, যে সমস্ত কথা হইয়াছে চিন্তা করিয়া দেখুন।"

তিনি আরও বলিলেন—"এ বড় বেশী কথা নয়। এ তো অতি সামান্য কথা ! যিনি ভগবানকে লাভ করেন—অষ্ট-সিদ্ধি পর্য্যন্ত তাঁহার চরণতলে !"

এর পর আমি আর কি জিজ্ঞাসা করিব—ভাবিয়া পাইলাম না। সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা আপনি কত দূর উঠিতে পারিবেন ? (উন্নতি করিতে পারিবেন !) আপনি কি তাহার কোনও সীমা রাখেন ?"

ঠাকুর—বুঝিতে পারিলাম না। বুঝাইয়া বলুন।

আমি—ধরুন, রামকৃষ্ণ পরমহংস। আপনার কি মনে হয় ? আপনি কি কখনও এতদূর উঠিতে পারিবেন ?

ঠাকুর—ইহা তো আমার কাছে মোটেই অসম্ভব বোধ হয় না।

আমাদের সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্টতর হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দুবেলাই তাঁহার

বাসায় যাতায়াত করি। ঠাকুরও বিকালে প্রায়ই আমাদের বাসায় আসেন। দুই একটী গল্পও হয়। আমরা দুই জনে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহাকে অনুসরণ করি।

সেই সময় প্রথম অবতার-বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। ঠাকুর আমাদিগকে এই মাত্র বলিয়াছিলেন—তিনি কোনও সিদ্ধপুরুষের মুখে শুনিয়াছেন—ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং সত্বরই প্রকাশিত হইবেন। তিনি নিজেও এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, শিলচর সহরে জনৈক পরিব্রাজকও প্রকাশ্য সভায় এ কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমাদের এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। সমগ্র জগৎ এখন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, যখন শান্তি-সংস্থাপনের জন্য, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের জন্য, তাঁহার আসা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে একদিন অরবিন্দ বাবুর কর্ম্মযোগিন্ (Karmayogin) পত্রিকায় একটা কথা দেখিলাম। পূর্ব্বে আমাদের সমস্ত জাতীয় চেষ্টায়, কেন এত দুর্ব্বলতা দেখা গিয়াছে, তাহারই আলোচনায়, প্রসঙ্গক্রমে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—**Above all, the Avatar had not descended.**

এ কথায় আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল। আমরা নির্ভয়ে অবতার-বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিলাম। সেই সময়কার মানসিক অবস্থা বর্ণনাতীত। সহসা আমাদের চোখের সাম্‌নে একটী প্রহেলিকার রাজ্য খুলিয়া গেল! ইতিহাসের অর্থ নূতন ভাবে পড়িলাম। নিজ জীবনের ঘটনানিচয়ের মধ্যে একটী গূঢ়তর অর্থ—একটী সুন্দর ধারাবাহিকতা দেখিলাম। সৌভাগ্যবান্ আমরা—এমন শুভযুগে জন্মিয়াছি।

বৃন্দাবনের যিনি মহানট—সম্মুখে তাঁহারই মধুরাতিমধুর লীলা। সে যুগের যাঁহারা অভিনেতা—কে বলিবে তাঁহারাই আবার বিচিত্রতর অভিনয়ের জন্য, নরকলেবর ধারণ করিয়া আসেন নাই? আমরা কল্পনা-নেত্রে দেখিলাম—জগতের রঙ্গমঞ্চ হইতে, দৃশ্যপট সমূহ একে একে সরিয়া যাইতেছে—আর নবীনতর—উজ্জ্বলতর দৃশ্যপট সেস্থান গ্রহণ করিতেছে।

প্রজাশক্তিতে প্রচার—তুমুল আন্দোলন।

২৪শে মাঘের "প্রজাশক্তিতে" আমার "অরুণাচল" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, "………বড় মনোহর মূর্ত্তি, নবীন যৌবন, দীর্ঘায়ত সুগোল দেহ, সুবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশ, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, স্নেহময় মুখ—মুখে হাসি ধরে না।

………সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির কথাও শুনিয়াছি; সত্য মিথ্যা আমি জানি না। আমি অষ্ট-প্রহর তাঁহার মুখে হাসি দেখিয়াছি। যারা গালি দিতেছে, তাদের প্রতিও তিল মাত্র বিরক্তির ভাব নাই—প্রতিহিংসা তো দূরের কথা! গভীর বিশ্বাস—অপার আশা—আকাশের মত উদার হৃদয়—বন-বিহগের মত মুক্ত প্রাণ। নিয়মের নাগপাশে আত্মার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে পারে নাই। আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই—সত্যকে পূর্ণভাবে দেখিবার সাহস আছে। প্রশান্ত চিত্ত মাঝে মাঝে উদ্বেল হয়। তখন মুখ গম্ভীর হইয়া উঠে। আবেগভরে

চোখে অশ্রু ঝরে। বসন্ত-সমীরণের মত চারিদিকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন।........."

আর আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—"অরুণাচল সত্য সত্যই নবযুগ প্রবর্ত্তন করিবে। হৃৎপিণ্ডের মত সমগ্র সমাজে, ব্রহ্মতেজ সঞ্চারিত করিবে। বিপুল প্রেমপ্রবাহে দেশ ভাসিয়া যাইবে। বহু শক্তিশালী পুরুষ অচিরে আকৃষ্ট হইবেন। শত শত যাত্রী আশ্রম দেখিতে যাইবেন। ভবিষ্যতের সে চিত্র আমি চোখে চোখে দেখিতেছি। মহাশক্তির বিচিত্র লীলা যে না দেখিবে সে চক্ষু থাকিতেও দৃষ্টিহীন!"

সেই সংখ্যাতেই শ্রীমান নগেন্দ্রনাথের 'নবযুগ' প্রবন্ধ বাহির হয়। সে লিখিয়াছিল "সত্যযুগ আসিয়াছে—যে যুগে প্রেমশক্তির প্রাধান্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে যুগে আমাদের গৃহে গৃহে মহাযোগী—অরণ্যে অরণ্যে তপোবনের আবির্ভাব হইবে—সে যুগ আসিয়াছে। এ যুগে ভারতবাসী মহাত্যাগী ও মহাভোগী হইবে। ত্যাগ ও ভোগের প্রকৃত রহস্য প্রচারিত হইবে। পূর্ণ মানব হইতে হইলে, ত্যাগের সহিত ভোগের......প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সমন্বয় করিতে হইবে। প্রাচ্যে ভগবান ত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—প্রতীচ্যে ভোগের চরম অবস্থা! প্রাচ্যে তাঁহার লীলা, প্রতীচ্যেও তাঁহারই লীলা—একই লীলাময় লীলা করিতেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবের সম্মিলনে, নবযুগের মানবে পূর্ণতা লাভ করিবে। নবযুগের প্রবর্ত্তকগণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। তাঁহারা একাধারে ত্যাগী—সন্ন্যাসী—জীবন্মুক্ত; অপরদিকে ভোগী—লীলাপ্রিয়—রঙ্গপ্রিয়—আনন্দময় হইবেন। আনন্দ—আনন্দ—আনন্দই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। প্রাণে ভগবানের লীলা—

ভগবানের সত্ত্বা অনুভব করিয়া, ঘন—নির্ম্মল—অপ্রমেয় আনন্দ ভোগ করিতে হইবে। অপর দিকে উৎকৃষ্ট আহার, উৎকৃষ্ট শয্যা, উৎকৃষ্ট বসন—উত্তম বিলাস হইতে আনন্দ আকর্ষণ করিতে হইবে।... ... কেবল এক প্রকার আনন্দ লাভ করিলে, মানুষ সঙ্কীর্ণতা-প্রাপ্ত তামস-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে; তাই উভয়বিধ আনন্দ ভোগ করিয়া—যোগানন্দ, ভোগানন্দ আস্বাদ করিয়া, পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে হইবে। মানুষকে পূর্ণ হইতে হইবে—নব ভারত এই বার্ত্তা প্রচার করিবে।

তোমরা বলিতে পার 'দেশতো দেখিতেছি, নীচতা—দারিদ্র্য—সঙ্কীর্ণতার লীলাভূমি—তোমাদের যুবকদের প্রাণও তো দেখি নীরব—নিস্পন্দ। কোনও মহাভাবের আঘাতে ঝঙ্কার দিয়া উঠে না। তবে তোমাদের আশা কি?' আমাদের আশা কি? যখন গগনময় গাঢ় অন্ধকার বিরাজ করে, তখন যাঁহারা উচ্চস্থানে থাকেন, তাঁহাদেরই দৃষ্টিপথে প্রভাতের কুঙ্কুমালোকের ক্ষীণ আভাস প্রথম পতিত হয়। তাঁহারা তখন উল্লাসে আত্মহারা হইয়া উঠেন। জগৎময় প্রচার করেন—দুঃখনিশা অতিবাহিত—শুভদিন আসিয়াছে। তেমনি উচ্চস্তরের মহাপুরুষগণ ভারতের ললাটে সত্যযুগের কনকরেখা দেখিতেছেন।"

কিছুদিন পরে, ১৬ই ফাল্গুনের "ধর্ম্ম" পত্রিকায় "ত্যাগ ও ভোগ" শীর্ষক, ঠিক এই ভাবের একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিত ছিল "আমাদের দেশে, সাধারণতঃ, ত্যাগের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। বহুবৎসরের নিরাশা ও অধীনতায়, আমরা ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। কিন্তু আবার ইহাও ঠিক যে, বিনা ভোগে ত্যাগ সম্ভব নয়। যে কখনও কিছু ভোগ করে নাই, তাহার ত্যাগ

করা কিরূপে সম্ভবে? যে কখনও উত্তম আহার, উত্তম বসন ভূষণ ভোগ করে নাই, তাহার উত্তম আহার—বসন ভূষণ ত্যাগ করা, ত্যাগই নহে। বসনহীনের কৌপীন গ্রহণ কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অতএব আমাদের পূরামাত্রায় ভোগ করা চাই। সর্ব্বোচ্চ ভোগ না হইলে, সর্ব্বোচ্চ ত্যাগ সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ধর্ম্মই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল দেশের ধর্ম্মই স্বর্গ কিম্বা অন্য একটী লৌকিক ধর্ম্ম লইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম্ম—ত্যাগ ও মুক্তি ও ভগবানের সহিত প্রয়োজনহীন লীলা। এখানে লৌকিক কিছুই নাই। কিন্তু পূর্ণত্যাগ—পূর্ণভোগ নহিলে সম্ভবে না। ভারতের পূর্ব্বতন রাজগণ পূর্ণভোগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন।"

যে দিন আমার প্রবন্ধটী বাহির হইল, সে দিনই হবিগঞ্জ সহরে একটী হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাত্রে একজন ভদ্রলোকের বাসায়, অনেকে ঠাকুরকে দেখিতে ও তাঁহার গান শুনিতে আসিলেন। ইনি এত উন্নতি করিয়াছেন শুনিয়া, কেহ কেহ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সহরের অধিকাংশ লোকেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না, আমরা ইহার মধ্যে এমন কি গুণ দেখিলাম। কতপ্রকার কল্পনা জল্পনা চলিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। অনেকেই মনে করিলেন, আশ্রমের কার্য্যের ভিতর রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিশ্চয়ই আছে, নতুবা আমাদের মত স্বদেশীরা কি দেখিয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। শ্রীহট্ট সহরেও আমার প্রবন্ধ লইয়া ভারি আন্দোলন আরম্ভ হইল। অনেকের নিকট এ একটী স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, যাঁহাকে তাঁহারা শৈশব হইতে দেখিয়া আসিয়াছেন—সে কোন কালেই বড় লোক হইতে পারে না। "এই যে সেদিন আমার সঙ্গে

পড়িল—এই যে সেদিন আমার সঙ্গে হবিগঞ্জে দেখা—এই যে সেদিনকার গুরুদাস চৌধুরী" ইত্যাদি গভীর যুক্তির অবতারণা হইতে লাগিল। অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ধুতি চাদর পরেন, পান তামাক খান, পায়ে জুতা, হাতে তিনটী সোনার আংটী; এ কোন দেশী সাধু!" বিশেষতঃ, তিনি সংস্কৃতের ধার ধারেন না। সহজ প্রাঞ্জল কথায় উপদেশ দেন। তাহা না হইলে বরং বিবেচনার বিষয় হইত! একদল স্থির করিলেন, ইহাতে কোন গুণ থাকাই সম্ভবপর নয়। আন্দোলনের বেগ যতই খরতর হইল, আমাদের অনুরাগও ততই প্রবল হইতে চলিল। ইহার তিন চারিদিন পর, ঠাকুর আমার আত্মীয় একটী ছেলেকে নিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আমরাও সঙ্গে চলিলাম। সে যাত্রায় তিনি কয়েকটী লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"তোমরা শত চেষ্টা করিলেও, কিছুতেই ইহাদের ধর্ম্মে মতি হইবে না।" তাঁহার কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে।

শ্রীহট্ট হইতে ফিরিবার সময়, পথে একটী আত্মীয়ের বাসায় আমরা দুই তিন দিন ছিলাম। সেখানে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাত্রে সাধন করিতে বসিয়াছি—কিছুক্ষণ পরেই দেখি শরীর হাল্‌কা বোধ হইতেছে। পরে শরীর যন্ত্রবৎ চালিত হইয়া, কয়েকঘণ্টা পর্য্যন্ত অতি কঠোর যোগের ক্রিয়া হইতে থাকে। আমি এ সকলে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত; পরে বহু চেষ্টায় ইহার একটী ক্রিয়ারও অনুকরণ করিতে পারি নাই। পর রাত্রে নগেন্দ্র কাছে বসিয়া দেখিতেছিল—আমি মাঝে মাঝে কথা বলিয়া দেখাইলাম—আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে; কিন্তু কোন ক্রিয়ার পর কোন ক্রিয়া হইবে, কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না। অথচ

সেদিন ক্রমশঃ আরও কঠিনতর ক্রিয়া সকল হইতেছিল। এবং এত দ্রুত হইতেছিল যে, কখন কখন মিনিটে দুই তিনটি করিয়া ক্রিয়া হইয়া যায়।

৭ই ফাল্গুন, হবিগঞ্জ ফিরিবার সময় করিমগঞ্জ ষ্টেশনে আসিয়া দেখি—ঠাকুর স্বামী হংসানন্দকে লইয়া সেই ট্রেণেই হবিগঞ্জ যাইতেছেন। পর দিনের প্রজ্ঞাশক্তিতে "অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিলাম। একটী মধুচক্রে ঢিল ছুড়িলে যে অবস্থা হয়—প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবা মাত্র চতুর্দ্দিকে সেইরূপ হইল। এইরূপ ক্রিয়া কখনও হইতেই পারে না, আমাব মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে—চারিদিকে এরূপ বব উঠিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, একটী লোকও আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া, প্রকৃত ব্যাপাবটী কি জানিতে চেষ্টা কাবিল না। কোনও কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন "মহেন্দ্র বাবুকে হিপ্‌নটাইজ্‌ করিয়া ফেলিয়াছে, হিপ্‌নটিজমে এইরূপই হইয়া থাকে।" শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত—সকলেব নিকট এ অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত মনে হইল। অবশ্য হিপ্‌নটিজম্‌ সম্বন্ধে কেউ কখনও কিছু পড়েন নাই, একজনও দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অনেকে শব্দটী উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না।

স্বামী হংসানন্দের তখন অতি অপূর্ব্বভাব, একেবারে শিশুর মতন হইয়া গিয়াছেন। অনেক সময় পবিধানেব কাপড় খানির প্রতি পর্য্যন্ত দৃষ্টি থাকে না। এক এক বার মৃদু মৃদু হাসেন—মুহুর্মুহু ভাব হয়। তাঁহাকে নিয়াও কত ঠাট্টা পরিহাস চলিল, তাহাব সীমা নাই। বিশেষতঃ অরুণাচলে গেলে যে মাথা খারাপ হইয়া যায়, তাহার অকাট্য প্রমাণ

মিলিল। এমন অবস্থা হইল যে, রাস্তায় বাহির হইলে ছেলেপিলে আমাদের মুখের দিকে তাকায়, গ্রাম হইতে কোনও পরিচিত লোক আসিলে, প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখে—আমরা প্রকৃতিস্থ আছি কি না। কেউ কেউ বলিল—"আপনাদের গায়ে ধূলি পড়িবে।"

ইতিমধ্যে ভজনানন্দ* ও অন্য একটী ভক্ত আশ্রম হইতে আসিলেন। কৌতূহলবশে সেবার বহুলোক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল—তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশে মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অনেকজন ছাত্রও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১০ই ফাল্গুন তাঁহারা পত্র দিয়া জানাইলেন যে, সম্প্রতি ধর্ম্মের দিকে আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়ায়, তাঁহারা আমাদিগকে আর জাতীয়-বিদ্যালয়ের কর্ম্মে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কেহ কেহ আমাদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কুৎসা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঠাকুরের বিরুদ্ধে উত্তেজনা চরমে পৌঁছিয়াছে। সে সময়ে হবিগঞ্জে কিরূপ আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা স্থানীয় বিরুদ্ধবাদী—হাসি-কান্না (?) নামে পরিচিত—দল বিশেষের প্রকাশিত একখানি পুস্তিকার উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

"মহা মহা পণ্ডিতগণ তাহাদের প্রচারিত অসার বাসনাময় যোগাসনের না জানি কি ফলের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।"

* * * * * * * *

"আসর খুব জাকিয়া উঠিল। এমন কি কোনও কোনও ভগবান-

---

* কলিকাতা বাগবাজারে ইহার বাড়ী, বয়স আনুমানিক ৩৫।৩৬ বৎসর; রেলওয়ে মেল সার্ভিসে Head Sorterএর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

পাদপদ্মলাভ-প্রয়াসীর অন্তরও এ অভিনয়ের জাকজমক দর্শনে আকর্ষিত হইল। * * * * * *"

"ছেলে সব হলো পাগল যোগ-ফলাফল পাবার লোভে * *"

"* * * * * * সাধু সন্ত দেখে অবাক, পাড়ায় ছেলে মজলো বেবাক।"

* * * * * * * *

শ্রীভগবানের বিচিত্র লীলা! তিনি বিরুদ্ধবাদীদের তুলিকায়ই তা'দের অজ্ঞাতসারে হবিগঞ্জের তৎকালীন অবস্থার একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে স্থানীয় একটী ভদ্রলোকের বাসায়, ঠাকুরের কীর্ত্তন হইল; যাঁহার সংকীর্ত্তন শ্রবণে সহস্র সহস্র নরনারী প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছেন, স্থানীয় বিজ্ঞ মহোদয়গণ তাঁহাতে কিছুই বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন না।

এই সময় হইতে প্রজাশক্তি, নবযুগ ও অরুণাচল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে পূর্ণ থাকিত। অনেকেরই ইহা বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। অরুণাচলের নাম শুনিলেই তাঁহাদের গাত্র-দাহ উপস্থিত হইত। প্রজাশক্তি "অরুণাচল-প্রকাশিকা" হইয়া উঠিয়াছে, এই বলিয়া তাঁহারা কাগজ ফেরৎ দিতে লাগিলেন। আমরা কিন্তু নির্ভয়ে সত্য প্রচার করিয়া যাইব, দৃঢ়সংকল্প করিলাম।

১৫ই ফাল্গুনের কাগজে "তিনি আসিয়াছেন" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, অবতার বার্ত্তা ঘোষণা করিলাম। সেই প্রবন্ধে লিখা হইয়াছিল :—

"ধন্য আজ বিশ্ব ধন্য—ধন্য ধন্য ভারত ধন্য—সর্ব্বজ্বালাহারী, পাপ-তাপ-

নাশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন—তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার চরণরেণুস্পর্শে ধরা অমরা হইয়া যাইবে। কেহ হয়তঃ তাঁহাকে জানিবে, কেহ হয়ত তাঁহাকে জানিবে না—কোনও পাষণ্ড হয়তঃ কলসীর কানায়, এই হেম-গোরা-অঙ্গে অমিয়-রক্তধারা ছুটাইবে। উন্মাদ আনন্দের—সাগর-প্রমাণ সুখের দিবস আসিয়াছে—এস এস অমৃত সাগর প্রেমতরঙ্গে উথলিয়া বহিতেছে—চিরদিন এমনি বহিবে না; সময় থাকিতে ছুটিয়া এস।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, পরবর্ত্তী সপ্তাহের ধর্ম্ম পত্রিকার "নব জাগরণ" শীর্ষক প্রবন্ধেও অবিকল এই ভাবের কথাই লিখা হয়। সেই প্রবন্ধের শেষভাগে ছিল "পূর্ণব্রহ্ম এবার নরকলেবরধারী—অন্যান্য অবতার তাঁহার কর্ম্মচারী মাত্র। তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য এবার বহু অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন—আজ সময় আসিয়াছে, যে লোকে তাঁহাকে জানিবে, জানিয়া নববলে বলীয়ান হইয়া কার্য্য করিবে। এ কথা বিশ্বাস কর ও হৃদয়ে ধারণা কর।" প্রজ্ঞাশক্তির প্রবন্ধের যাঁহারা তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই তখন সুর বদলাইতে আরম্ভ করিলেন।

"হবিগঞ্জে দয়ানন্দ" প্রবন্ধে সেদিনকার কীর্ত্তনের প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছিল "দয়ানন্দ আকটিনগ্ন-হেমাঙ্গের প্রভায় নয়ন ঝল্‌সাইয়া—চক্ষে দিব্য-দীপ্তি বিচ্ছুরিত করিয়া—আলীঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইয়া—যখন সঙ্গীত ধরিলেন, তখন সকলের হিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইল। প্রেমোন্মাদে অধীর হইয়া বহু যুবক সঙ্গী হইয়া ছুটিলেন। স্বামিজী অভিভাবকের আদেশ আনিতে না বলিলে,

বোধ হয়, সেই সর্ব্বনেশে বংশীরবে পাগলিনী ব্রজাঙ্গনাদের অবস্থার পুনরভিনয় হইত..............."

পূর্ব্ববার যে ছেলেটী ঠাকুরের সঙ্গে আশ্রমে গিয়াছিল, ইতিমধ্যে সে ও কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইল। তাহার "আগমন ও আহ্বান" প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহও যে সোনা হইয়া যায়, তাহারই অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিলিল।

ইহার দুই একদিন পরেই ঠাকুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। রমানন্দ*, কেবলানন্দ† ও অপর দুইটী বালক একান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করায়, তাহাদিগকে সঙ্গে আনিলেন।

এই সময় আশ্রমের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিষদৃষ্টি পতিত হইল। অধস্তন পুলিশ কর্ম্মচারীরা আশ্রমকে একটী প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, অচিরেই আশ্রম উঠাইয়া দিতে হইবে। তা'রা ঠাকুর ও আশ্রমবাসীদিগকে নিগৃহীত করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। সুযোগের অভাব হইল না। যে চারিটী ছেলে ঠাকুরের সঙ্গে আশ্রমে আসিয়াছিল—তাহাদের একজনের পিতা, হবিগঞ্জ পুলিশে অভিযোগ করিল, ঠাকুর ও অন্য দুইজন ভক্ত কয়েকটী বালককে অবৈধ ভাবে শিলচর লইয়া আসিয়াছেন। তাহার পুত্র ইহাদের অন্যতম। শিলচর পুলিশ, কোনরূপ তদন্ত না করিয়াই, ঠাকুর ও ভক্ত দুইজনকে

* ইহার নাম নরেশচন্দ্র দত্ত, বাড়ী শ্রীহট্ট জিলার বারৈপেত গ্রামে, বয়স ১৮ বৎসর।
† ইহার নাম দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র পুরকায়স্থ, শ্রীহট্ট দিনারপুরে বাসস্থান, বয়স ১৭ বৎসর।

গ্রেপ্তার করিল। পরদিন তাঁহাদিগকে হাতে হাতকড়া দিয়া হবিগঞ্জ পাঠাইল। ঠাকুরের এইরূপ অযথা নিগ্রহে ভক্তদের মর্ম্মে দারুণ আঘাত লাগিল; কিন্তু তাঁহার মুখে কোনও প্রকার ভাব-বিপর্য্যয়ের চিহ্ন মাত্রই নাই! তিনি প্রসন্ন-বদনে নির্য্যাতন গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিয়া তেজোপূর্ণ স্বরে কহিলেন "তোমরা চিন্তা করিও না, মা যাহা করেন সকলই মঙ্গলের জন্য। একদিন ধর্ম্মের জন্য যীশু ক্রূশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, আজ আমার জীবনের অতি শুভদিন—আমি ধর্ম্মের জন্য নির্য্যাতন সহ্য কবিতে যাইতেছি। আরও কত সহ্য করিতে হইবে—ইহা সূচনা মাত্র।"

এই সময়, ঘটনাবশতঃ, আমি শিলচর উপস্থিত ছিলাম। অন্য একটী যুবক (অদ্বৈতানন্দ)* আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি জাপান যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ঠাকুরেব অবিচলিত ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ইনি নিশ্চয়ই মানুষ নহেন—মানুষে এমন অবিচলিত ভাব থাকিতে পারে না।" এই ঘটনায়, তিনি ঠাকুরের প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইলেন যে, তাঁহার আর জাপান যাওয়া হইয়া উঠিল না। ঠাকুর ও তাঁহার সঙ্গীরা হবিগঞ্জ থানায় উপস্থিত হইবামাত্র, বালক চারিটীকে বয়স নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারের নিকট পাঠানো হয়। পরীক্ষায় প্রত্যেকেরই বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক প্রতিপন্ন হওয়ায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সকলকে নিষ্কৃতি দিলেন। অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও মঙ্গল আসে—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এই ঘটনায় অরুণাচলের নাম দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িল, এবং বহুলোক আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

* শ্রীহট্ট জিলার জলসুকা গ্রামে ইহার বাড়ী, নাম কৃষ্ণকুমার রায়, বয়স ২৬।২৭ বৎসর হইবে।

শক্তি-সঞ্চার ও পুলিশ-নিগ্রহ।

এই সময়ে বহু লোকের উপরে ঠাকুরের শক্তিসঞ্চার-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। যাঁহারা তত্ত্বপিপাসু হইয়া দেখা করিতে আসেন, তা'দের মাঝে বিষম পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। (এই পুস্তকের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে দুই চারিটী ঘটনামাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে)। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ, ইহাদের অন্যতম। ইনি শিলচর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে একজন অগ্রণী—যথার্থ তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তি। ইনি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে আরম্ভ করেন। একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন "আমার চিত্ত স্থির ও নির্ম্মল হয়, এবং ভগবানকে দর্শন ও তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে পারি, ইহাই আমার প্রাণগত ইচ্ছা।" ....আপনি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারেন কি না?" যে দিন ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়, সেদিন তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন—তাঁহার নির্ভীক ও প্রফুল্লভাব দর্শনে বড় আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। সে দিন রাধিকা বাবুর বাসায় আমার সঙ্গেও তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয়। অরুণাচলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যে অতি উচ্চ আশা পোষণ করি, এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে যাহা শোনা যায় তাহা যে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নয়, আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

সে যাত্রায় হবিগঞ্জ হইতে ফিরিবার অল্পদিন পর, ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শ্রীগৌরাঙ্গ উৎসবে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে, ইনি মাঝে মাঝে সুরেন্দ্র বসুর বাসায় আসিয়া, ঠাকুরের সঙ্গে

আলাপাদি করিতেন। দুই একদিন তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণেরও সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সময় ঠাকুর আসাম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমরা অনেকেই তখন শিলচর আসিয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ ২৪শে চৈত্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে, ঠাকুরের সহিত আলাপ করিতে আসেন। সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়। অবতার-বার্ত্তা প্রচার করিয়া আমরা সর্ব্ব-সাধারণের নিকট অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিতেছি, তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে দুজনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। সুরেন্দ্র বাবুর অচিরেই একটা বিষম পরিবর্ত্তন হইবে, হবিগঞ্জে থাকিতেই ঠাকুর আমাকে এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন। সুরেন বাবুর স্বরচিত বিবরণটী বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক—নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল:—

"আমার বড় বিরক্তি হইল—ভাবিলাম্, মিছামিছি এখানে আসিয়া কোন ফলই হইতেছে না। যদি ইঁহার কোনও শক্তি থাকে, পরীক্ষা করিয়াই দেখা উচিত; অন্যথা এখানে আর যাতায়াতের আবশ্যক নাই। ঠাকুরকে তখনই ডাকিয়া স্থানান্তরে, অন্য এক ঘরে নির্জ্জনে নিয়া গেলাম, এবং খুব অল্প কথায়, তিনি আমার জন্য কিছু করিতে পারেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন 'এখন কিছু বলিব না, এখন বৃহস্পতির শেষ, আপনি রাত্রে আসিবেন ....' আহারান্তে, রাত্রে নয়টার সময়, পুনরায় তারাপুরে গেলাম............ আমাকে দেখিয়া ঠাকুর একতারা নিয়া সঙ্গীত ধরিলেন:—

'প্রেম নদীতে কতই ধার—পাড়ী ধরিলে সে জান্‌তে পার।
যাঁরা পার হয়ে ওপারে গেছে তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা কর॥

প্রেমময়ীর কৃপা যার সে এবার হইবে পার।’

*　　*　　*　　*　　*

আমাকেই লক্ষ্য করিয়া গানটী গাহিলেন—স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই, তিনি আমাকে ডাকিয়া গৃহান্তরে লইয়া গেলেন; ......বলিলেন ‘এইমাত্র সঙ্গীতে শুনিয়াছেন মায়ের কৃপা না হইলে কিছুই হয় না, মায়ের কৃপার উপর নির্ভর করুন, আপনার যদি কিছু হয়, তাঁহার কৃপাতেই হইবে।’ এই বলিয়া তিনি আমাকে সাধন-প্রণালী উপদেশ দিয়া, আমার ভিতরে শক্তিসঞ্চার করিলেন। আমার জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম, শরীরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া, আমার হস্ত পদ ও অঙ্গকে যদৃচ্ছাক্রমে সঞ্চালিত করিতেছে। বাঁধা দিতে চেষ্টা করিলাম—প্রয়াস নিষ্ফল হইল। কি হইতেছে, বুঝিতেছি—ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি—স্পর্শাদি অনুভূতিও ঠিক রহিয়াছে; কিন্তু স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিলাম, শরীরের স্পন্দন ও সঞ্চালনাদি, অন্য এক অজ্ঞাত শক্তির অধীনে সম্পাদিত হইতেছে। দেখিলাম, ঐ শক্তি সচেতন—যে সব ক্রিয়া হইতেছে, তাহার মধ্যে বেশ কৌশল আছে। অনেক ক্রিয়াই খুব দ্রুত সম্পাদিত হইতেছিল। কিন্তু ঐ শক্তির লক্ষ্য ছিল, আমার কোনও কষ্ট না হয়। এই সমস্ত ক্রিয়া কি, এবং কেনই বা হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন—‘এ গুলি হঠযোগের ক্রিয়া—সাধককে বহুকষ্টে এ সকল অভ্যাস করিতে হয়, তোমার ভগবৎ কৃপায় আপনা হইতেই বিনা চেষ্টায় এ সব হইতেছে। সাধনকালে প্রত্যহই এ প্রকার ক্রিয়া হইবে। উত্তরোত্তর এ সকল বৃদ্ধি পাইবে।

ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন ক্রিয়া হইবে, এবং এই সকল ক্রিয়ার উপকারিতা দিন দিন বুঝিতে পারিবে।.........'

অন্য ঘরে সংকীর্ত্তন হইতেছিল, আমি আর থাকিতে পারিলাম না।.........হাততালি দিয়া সঙ্গীতের ভাব ও তাল অনুসারে নাচিতে লাগিলাম। আমার কোনও দিন তাল বোধ ছিল না; এ জীবনে নৃত্য কি পদার্থ, কোনও দিন নাচিয়া বুঝিবার অবকাশ হয় নাই। আশ্চর্য্য দেখিলাম, বেশ তালে তালে হাত পা তুলিয়া আমার শরীর নাচিতে লাগিল। ঠাকুর অত্যন্ত গম্ভীর-স্বরে মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা' ধ্বনি করিতেছেন।........সর্ব্বসমেত প্রায় এক ঘণ্টা কাল এই ভাবে পরবশ থাকিয়া নৃত্যাদি করিলাম। তারপর শরীর ধীরে ধীরে সুস্থির হইল; এত যে পরিশ্রম হইল, তবু বিশেষ ক্লান্তি বোধ করিলাম না। প্রাণের ভিতর যেন কি একটী আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছিল।.........মনে নানা চিন্তা—এ সব কি দেখিলাম। সব যেন ভেল্কী বোধ হইতে লাগিল, এক একবার ঠাকুরকে ঘোর ঐন্দ্রজালিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আবার ভাবিলাম—না, ইনি একজন অসাধারণ শক্তিধর মহাপুরুষ। লোকে ইহাকে চিনিতে পারিতেছে না।............ঠাকুর ম্যাসমেরিজম্ জানেন—হিপ্‌নটিজ্‌ম্ দ্বারা লোক ভুলান—এরূপ জনরব আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। এই কি হিপ্‌নটিজমের ব্যাপার? হিপ্‌নটিজম্ বিষয়টী কি ভাল জানা ছিল না; কিন্তু নিদ্রা উপস্থিত করিয়া ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য করানোই হিপনটিজমের উদ্দেশ্য ইহা জানা ছিল। আমারতো নিদ্রা উপস্থিত হয় নাই; পূর্ব্বাপর জ্ঞান ছিল। সুতরাং তাই বা

কি করিয়া হইবে। মনে কত কিছু তোলপাড় হইতে লাগিল। পর দিন আর ঠাকুরের নিকট যাইতে পারিলাম না। সারাদিন নানা চিন্তায় কাটিয়া গেল। প্রাতে ও রাত্রে সাধনা করিলাম, তখনও শরীরে নূতন নূতন ক্রিয়া হইতে লাগিল। সাধন করিবার জন্য, প্রাতে ও রাত্রে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিলাম হয়তঃ বা, এই দুই নির্দ্ধারিত সময়ে আমাকে স্মরণ করিয়া শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাতেই ঐ রকম ক্রিয়া হয়। পরীক্ষার জন্য একবার অন্য সময় সাধনে বসিলাম, দেখিলাম তখনও ক্রিয়া হইল। তৃতীয় দিন রাত্রে, তারাপুরে ঠাকুরের কাছে গেলাম। তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে, অন্য ঘরে ডাকিয়া নিলাম। সেইখানে গিয়া বসিবা মাত্র, আমার শরীরে নানা ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। ....”

এই দিন ডাক্তার, ব্রাহ্মসমাজে যাবেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, ঠাকুর বলিলেন—“কেন যাবে না? ব্রাহ্মসমাজে গেলে ক্ষতি কি? কোনও সমাজের সঙ্গেই আমাদের বিরোধ নাই, ইহাতে বরং তাহাই দেখা যাইবে।”

ডাক্তার—সেখানে গেলে যদি এই প্রকার শরীরের ক্রিয়া হয়?

ঠাকুর—তাহাতে লজ্জা কি? নিজে যাহা সত্য বুঝিলে, লোকে কি মনে করিবে ভাবিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। লোকের কথাকে ভয় করিবে না। হইতে পারে, তোমার শরীরের এইরূপ ক্রিয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের লোকের উপকার হইবে।

পর দিন প্রাতের গাড়ীতেই ঠাকুর বারো জন ভক্তসহ নাম প্রচারোদ্দেশ্যে আসাম যাইবেন। ডাক্তার লিখিতেছেন “ঐ দিন খুব ভোরে

আসিয়া সাক্ষাৎ করিলাম। গাড়ীতে আসিয়া ঠাকুর আমার গলা ধরিয়া বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। প্রাণ আনন্দে ভরপুর, হাস্য কৌতুক ও নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইলে, আমি নামিয়া পড়িলাম। ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখি—তাঁহার তীব্র মদিরাময়ী উন্মাদিনী দৃষ্টি, আমার উপর অনিমেষ ভাবে, অবিশ্রান্ত বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। সে দৃষ্টির বর্ণনা হয় না—মন প্রাণ কাড়িয়া লইল। আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলাম। বাইসিকেল্ ধরিয়া হাঁটিয়া ছুটিতে চেষ্টা করিলাম—কিন্তু পারিলাম না। মাতালের ন্যায় টলিতে লাগিলাম। ঠাকুর আসামে চলিয়া গেলেন। এ দিকে সহরের সর্ব্বত্র অতি অল্প সময়েই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, আমি দয়ানন্দ স্বামীর শিষ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এইরূপ পরিবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব হইল, লোকে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, যাহার মনে যাহা আসিল—তাহাই বলিতে লাগিল। দুই তিন সপ্তাহকাল হাটে, ঘাটে, মাঠে, কাছারীতে অন্য কথা নাই, কেবল আমার বিষয় নিয়াই আলোচনা ও কল্পনা জল্পনা চলিতে লাগিল। কেহ বলে, স্বামিজীর বিশেষ কোনও অলৌকিক শক্তি আছে। কেহ বলে তিনি আমাকে হিপনটাইজ্ করিয়াছেন, ইত্যাদি।

এদিকে আমার মনে এক আশ্চর্য্য উৎসাহের সঞ্চার হইল ও প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ চলিতে লাগিল। ইচ্ছা হয়, সকল লোককে ডাকিয়া আমার পরিবর্ত্তনের কথা বলি। ইচ্ছা হয়, যাহাকে পাই, ধরিয়া কোল দেই। কার্য্যতঃ প্রায় তাহাই করিতে লাগিলাম। অনেক লোককে ডাকিয়া আমার কাহিনী বলিতে লাগিলাম। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে অনেককেই কোল দিতে লাগিলাম।

অল্প দিনের মধ্যেই, এই সংবাদ আমার কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, শিলং, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের সমুদয় পরিচিত হিন্দু ও ব্রাহ্ম-বন্ধু-বর্গের নিকট প্রচারিত হইয়া গেল। ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু——একদিন মন্দিরে উপাসনাকালে বেদী হইতে বলিলেন—আমার এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার যত কষ্ট হইয়াছে, তাঁহার ২৫ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতেও তত কষ্ট হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার এই মত পরিবর্ত্তনের কি কারণ, তাঁহারা তাহা জানিতে চাহিলেন না। আমি তাঁহাদের নিকট নিজ হইতে বলিতে লাগিলাম; তাঁহারা শোনা প্রয়োজন বোধ করিলেন না। আমি গুরু স্বীকার করিয়াছি, অতএব আমার আর ব্রাহ্মসমাজে সভ্য থাকা উচিত নয়—তাঁহাদের এই প্রকার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, আমি ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যপদ পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ, ব্রাহ্মসমাজে ও ব্রাহ্মবন্ধুদের বাসায় যাইয়া উপাসনায় যোগ দিতে বিরত হইলাম না।"

শ্রীমান সূর্য্যকান্ত* (শ্যামানন্দ) আশ্রমে যোগ দেওয়ায়, তা'র ভ্রাতাগণ ভারি বিরক্ত হইয়া উঠেন। ঠাকুর একজন হিপ্‌নটাইজার্, তিনি লোককে ভুলাইয়া আশ্রমভুক্ত করিতেছেন, তাঁ'রা কয়েকজন বন্ধুর সহযোগে ডেপুটী কমিসনরের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুরেন্দ্র বাবুর কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের চরিত্রের উপর নানারূপ অমূলক কলঙ্ক আরোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

আশ্রমসেবক গোবিন্দচন্দ্র দে (অচ্যুতানন্দ) সবওভারসিয়ার ছিলেন।

* ময়মনসিংহ জিলার উয়ারা গ্রামে জন্ম, বয়স ২২।২৩ বৎসর।

তাঁহার কয়েক মাসের ছুটী প্রাপ্য ছিল। ঠাকুর আসাম যাওয়ার সময়, তিনি ছুটীর দরখাস্ত করিলেন, দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়াতে, অনেক লিখা পড়ার পর কাজে ইস্তফা দেন। তখন কথা উঠিল, যে ঠাকুরের শিষ্য হইলেই স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসী হইতে হয়। এই সময় পুলিশ আশ্রমসেবকদিগের উপর নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করে। লোকে যাহাতে ভয়ে আশ্রমে না আসে, সে পক্ষেও চেষ্টার ক্রটী হয় নাই। প্রত্যহ একজন পুলিশ আসিয়া আশ্রমের লোকও আগন্তুকদের নাম লিখিয়া লইত। ঠাকুর আসাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পরদিবসেই, আশ্রমে, সুরেন্দ্র বসুর বাসায় ও হবিগঞ্জে 'প্রজাশক্তি' আফিসে খানাতল্লাসি হয়, কিন্তু কোথাও অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

অল্পদিন পরে একটি বালক আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া বুঝিতে চায়, ইহাতে তিনি তা'র প্রতি অসন্তুষ্ট হন। সে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়া আশ্রমেব অনিষ্ট করিতে চেষ্টা কবে, কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ঠাকুরের অপার স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া, দিন রাত অশ্রুপাত করিত। পরে আর থাকিতে না পারিয়া আবার তাঁহার চরণে শরণ লয়। ঠাকুরেব করুণার সীমা নাই—তিনি বিন্দুমাত্রও তিরস্কার না করিয়া, তাহাকে আশ্রয় দিলেন। এই সব ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে, আমরা এক দিন তাহার প্রসঙ্গ তুলিলে, ঠাকুর বলিয়াছিলেন "তোমরা কি ইহা বুঝিতেছ না, আমার শত্রু মিত্র কেহই নাই। তোমরা যেরূপ আমার কাজ করিতেছ—সেও সেরূপ আমারই কাজ করিতেছে।" এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও, তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে স্থানে স্থানে

নামপ্রচার করিতে লাগিলেন। দলে দলে লোক পাগল হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। গৌর-প্রেমের জোয়ারে নিন্দা, কুৎসা, আতঙ্ক ভাসিয়া গেল। বানিয়াচঙ্গ, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব্ব কীর্ত্তনকাহিনী শুনিয়া বিরুদ্ধবাদিগণ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল। তিনি শিলচরে ফিরিয়া আসিলে, পুলিশের ইন্স্পেক্টার জানাইলেন, "তাঁহাকে একদিন অন্তর থানায় যাইয়া হাজিরা দিতে হইবে। তিনি আর কীর্ত্তন করিতে পারিবেন না, তাঁহার কীর্ত্তনে দেশ মাতিয়া উঠে ও লোকের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়।"

এইরূপ আইন-বিরুদ্ধ আদেশ পালনে ঠাকুর কিছুতেই প্রস্তুত নন্—ইহা স্পষ্টাক্ষরে জানাইলেন। এ দিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টও ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট তারযোগে সমস্ত অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিছু দিন পরে সূর্য্যকান্তের ভ্রাতারা পুলিশের যোগে, গ্রেপ্তারের ছল করিয়া তাহাকে বাসায় আনিয়া আবদ্ধ রাখেন।

এই সময়ে শিলচরে বাউল-বেশধারী একজন সাধুর আবির্ভাব হয়। সূর্য্যকান্তের মতি অরুণাচল হইতে ফিরাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার শুভাগমন। অরুণাচলের বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের কাছে তাঁহার খুব পসার হইল। তাঁহাদের মধ্যে অনেক পদস্থ লোক তাঁহার সেবায় রত হইলেন। পদসেবা ও বাতাস করা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। কেহ কেহ মন্ত্র গ্রহণ করিতেও আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ সূর্য্যকান্তের উপরেই বাউলের শক্তি-পরীক্ষা হয়। তিনি আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি অচিরেই সূর্য্যকান্তের মতি ফিরাইব।"

আজ তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের দিন। সূর্য্যকান্তের বাসায় আজ

দলে দলে ভক্তগণ সমবেত হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকান্তকে লইয়া বাউল একটী কক্ষে বসিলেন। হাতে একছড়া মালা—নানা তন্ত্র মন্ত্র আওড়াইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। সূর্য্যকান্ত একাগ্র-চিত্তে ঠাকুরের নাম জপ করিতেছিল। হঠাৎ কি এক কুহকে বাউলের হাতের জপমালা ছিঁড়িয়া ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অচেতন হইয়া ভূশায়ী হইলেন। ভক্তগণ অবাক! একে অন্যের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন—যে ভ্রাতাটী ষড়যন্ত্রের অগ্রণী ছিলেন, পরদিন হইতে তাহার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। বাউল সাতদিন ব্যাপিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও, উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না। তিনি চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরিত হইলেন। সাধুর প্রতিপত্তিতে তখন একেবারে ভাটা পড়িয়া গেল। ভক্তগণও অরুণাচল-দলনের আশা ছাড়িয়া দিয়া, একে একে সরিয়া পড়িলেন। ভগ্ন-মনোরথ হইয়া বাউল শিলচর ত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই শিলচরের ডেপুটী কমিশনার, লোকেল-বোর্ডের কর্ম্মচারী শ্রীযুত অখিলচন্দ্র গুপ্ত ও গুরুদাস রাহাকে আশ্রমের সংশ্রব ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন "চাকুরী যায় যাইবে—তাঁহারা কদাচ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন না।" অতি স্পষ্ট ভাষায়—নির্ভীক-ভাবে এই আদেশের প্রতিবাদ করিলেন। এ দেশের ইতিহাসে এরূপ স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বঙ্গ-দেশের স্থানে স্থানে বহুলোক তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আশ্রমের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ধর্ম্মের জন্য, অরুণাচলের লোক সর্ব্বপ্রকার নিন্দা, নিগ্রহ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন—লোকের এ বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।......

মাঘ মাসের মাঝামাঝি মৌলবী বাজারের নানা স্থানে নামপ্রচার করিয়া, ঠাকুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই, সুর্ম্মাভেলী ও হিল্ ডিষ্ট্রীক্টস্ এর পুলিশ-বিভাগের ডেপুটী ইন্স্পেক্টার্ জেনারল্ শ্রীযুক্ত কার্ণেক সাহেব, গবর্ণমেণ্টের আদেশে আশ্রমে আসিয়া ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল। সাহেব, ঠাকুরকে হাতকড়া দেওয়া ও সূর্য্যকান্তের গ্রেপ্তার প্রহসনের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। শিলচরের ডেপুটী কমিশনার দুষ্ট লোকদের দ্বারা ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন, তিনি ইহাও স্বীকার করেন—এবং আশ্রমবাসিগণ দ্বারা যে পর্য্যন্ত কোনও প্রকার আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তাবৎ আশ্রমের কার্য্যে সরকার বাহাদুর কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না—ইহাও জানাইলেন। অতঃপর আশ্রমের উপর যাহাতে কোনও প্রকার উৎপাত না হয়, সে বিষয়ে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া গেলেন। কার্ণেক সাহেবের সৌজন্যে ও মিষ্ট বচনে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভক্তবৃন্দ অতীব সুখী হইয়াছিলেন।

বলা মন্দ নহে, বিরুদ্ধবাদীরাও অজ্ঞাতসারে আশ্রমের যথেষ্ট হিত-সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের অবিরত চেষ্টায় দেশের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, আশ্রম ও ঠাকুরের নাম প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহার এত নিন্দা হইতেছে, নিশ্চয়ই তাঁহাতে বিশেষ মহত্ব আছে মনে করিয়া, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন। প্রতি-কূলতার মধ্য দিয়া ভগবান আমাদের মনে যথেষ্ট বল ও সাহসের সঞ্চার করিয়াছেন—নিন্দা প্রশংসায় বিচলিত না হইয়া, কিরূপে কার্য্য করিয়া

যাইতে হয়, তাহাও শিক্ষা দিয়াছেন।.........ধর্ম্ম ও সত্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছে—অরুণাচল অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছে।

প্রচার—তৃতীয় উৎসব।

এই বৎসরের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, ঠাকুর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় গৌরাঙ্গ-উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইলেন। অধিবাসিগণ উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। জন্মোৎসব-দিন প্রভাতকালে তিনি দ্বাদশ জন ভক্তসহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় পদার্পণ করিলেন; দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে ছুটিল। বৈষ্ণবের অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন—লোক সাধু দেখিতে আসিয়াছে—কত মালা, তিলক, নামাবলীর ঘটা দেখিবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেখিল কি? একজন মন্মথ-মনোহর পুরুষ; পরিধানে মূল্যবান রেশমী পরিচ্ছদ, চরণে কোমল মকমলের পাদুকা, অধরে তাম্বূলরাগ, ললাটে মার আশীর্ব্বাদী সিন্দূর। পশ্চাতে দ্বাদশ জন ভক্ত চলিয়াছেন—তাঁহাদের সরল হাসিমাখা মুখ, গায়ে গোলাপী জামা। এ দৃশ্য দর্শনে সকলে স্তম্ভিত হইলেন—কাহারও অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিল। উৎসবের অনুষ্ঠাতার একমাত্র শিশু-সন্তান তখন মৃত্যু শয্যায়—সে দিনই দেহত্যাগ করিবে বলিয়াই সকলের বিশ্বাস। শিশুটীকে এমন অবস্থায় রাখিয়াও অনুষ্ঠাতা ও তদীয় ভ্রাতৃগণ কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতেছেন; ঠাকুর তাঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া আবেগময়-স্বরে—গম্ভীর-ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আজ শ্রীবাসের আঙ্গিনায় মহাপ্রভু আসিয়াছেন।" সোনার কমল শিশুর মুখে মৃত্যুর আঁধার নামিতেছে—ভক্তগণ তাহার প্রাণরক্ষার জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জনৈক ভক্ত অত্যন্ত বিচলিত হইয়া, আপনার আয়ু দিয়াও শিশুর জীবন রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন—জানাইলেন। তখন বাড়ীর লোকের

বিশেষ অনুরোধে, ঠাকুর শিশুটীকে দেখিতে গেলেন। যাহা হউক ভগবানের কৃপায়, সে যাত্রা শিশুটী রক্ষা পাইল। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, ভক্তগণ-সঙ্গে ঠাকুর কীর্ত্তন-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন—উদ্দণ্ড কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনি প্রাণের আবেগে মেঘমন্দ্রে "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" গাহিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনস্থলীতে একটী নবশক্তি সঞ্চারিত হইল। লোক সকল উন্মত্তবৎ নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ঠাকুর ভাবাবেশে বারম্বার ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন—হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, ক্ষিপ্ত আনন্দ-তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল। অশ্রুজলে ধূলি ভিজিয়া গেল—উচ্ছ্বসিত আবেগবশে, কীর্ত্তন-প্রাঙ্গণের ধূলি উদরস্থ করিতে লাগিলেন। অল্প পরেই আবার দণ্ডায়মান হইয়া, হেমদণ্ডের মত মুগ্ধকর দু'টী বাহু উত্তোলিত করিয়া "প্রাণ গৌর" গাহিতে লাগিলেন। নয়ন যুগল মুহুর্মুহুঃ নব নব শোভা বিস্তার করিয়া ঢুলিতে লাগিল। সেই দৃশ্যে বহুলোক, বাতাহত কদলী-তরুর মত ঠাকুরের পদতলে পতিত হইল। এরূপ কীর্ত্তন পূর্ব্বে আর কেউ কখনও শ্রবণ করেন নাই। মানুষের মাঝে এরূপ প্রেম-বিকার, কেউ কখনও দেখেন নাই। সমাগত ভক্তবৃন্দের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকলে ঠাকুরের প্রেমে তখন অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। রেশমের জামা, মকমলের জুতা আর তাঁহাদের চোখে পড়িল না। বুঝিবা ভাবিতে লাগিলেন—না জানি কোন অজ্ঞাত শৈলপুরী হইতে, এই দিব্য-দেহধারী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। কীর্ত্তনে এমন অপার উচ্ছ্বাস হইয়াছিল যে, আমেরিকা-প্রত্যাগত একজন উচ্চ-শিক্ষিত যুবক পঙ্কোৎসবের প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। পরে ঠাকুরের চরণমূলে পড়িয়া আকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের প্রভাব মুসলমান সমাজকেও স্পর্শ

করিয়াছিল। বাদ্যকর-সম্প্রদায়ের কতিপয় মুসলমান, কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল ও পরদিন তাহাদেরই একজন, পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের গমন-পথ অবরোধ করিয়া, তাহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ, তাঁহার ও ভক্তদের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিল।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে ঠাকুর শিষ্যগণসহ শিলাউর গ্রামে গমন করেন। সেখানে অতীব উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু মুসলমানও কীর্ত্তন দেখিতে আসিয়াছিল। একদিন কীর্ত্তনে ঠাকুরের দেহে অপার্থিব লাবণ্য বিকশিত হইয়া, কতিপয় ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। শিলাউর হইতে বিন্ধাকুট, বিন্ধাকুট হইতে নাটঘর, তথা হইতে আখাউড়া হইয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

১০ই চৈত্র ঠাকুর বীরানন্দ,* বিমলানন্দ+ প্রভৃতি দশজন ভক্তসহ আসাম প্রদেশে যাত্রা করেন। সেই সময়ে দেশের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন; বোমার মাম্‌লা তখনও চলিতেছে—স্থানে স্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি হইতেছে—পুলিশ সাধু সন্ন্যাসী মাত্রকেই সন্দেহের চোখে দেখিতেছে। অরুণাচলের প্রতি তখন পুলিশের বিষদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ঠাকুর যে যে স্থানে যাইতে লাগিলেন—থানায় থানায় টেলিগ্রাম হইতে লাগিল। খাকীপরা দারোগা ও লাল পাগরীওয়ালা কনেষ্টবলগণই ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করিত। নানা

* ইঁহার নাম জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বাটী যশোহর জেলায় রাজাপুর গ্রামে, বয়স ২৫ বৎসর, শিলচরে চাকুরী করিতেন; বর্ত্তমানে আশ্রমবাসী হইয়াছেন।

+ ইঁহার নাম মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাড়ী হুগলী চুঁচুড়া সহরে—বয়স ৩৫ বৎসর। ইনিও রেলওয়ে মেল্ সার্ব্বিসে চাকুরী করিতেছেন।

জনরব উঠিল, কেহ বলিল—এরা ছেলে চুরি করিতে আসিয়াছে, কেহ বা আমাদিগকে ফেরার আসামী, কেহবা ঐন্দ্রজালিক বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় আমরা আসাম প্রদেশে প্রবেশ করিলাম। লামডিং কালীবাড়ীতে দুই দিন অবস্থান করা হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থা সত্বেও সহরের প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকই কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ও উপদেশে, তাঁহারা অভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। লামডিং হইতে ট্রেণে ছাপরমুখ (নওগাঁ জিলায়) আসিলাম। তথা হইতে শালমোরা গ্রামে, আশ্রম-সেবক শ্রীযুত গোপাল-চন্দ্র শর্ম্মার* (পরমানন্দ) বাটীতে গমন করিলাম। সেখানে প্রবল উচ্ছ্বাসে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। নানা জনরব ও পুলিসের আনাগোনা সত্বেও, সহস্র সহস্র নরনারী ঠাকুরকে দর্শন ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আসিতে লাগিল। পরদিবস "নামঘরে" কীর্ত্তন হইল। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে শত শত স্ত্রীপুরুষ কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। আসাম দেশের বৃহৎ করতালের ভীষণ ঝনঝনায় কর্ণ বধির হইতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তগণ সঙ্গে গগনবিদারী রবে, নাম সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে বিমোহিত হইলেন। পরে মহিলাগণ ঠাকুরকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিলে, তিনি তাঁহাদের সমাজে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন—ঠাকুরের কাঞ্চনমূর্ত্তি তখন নীরব নিস্পন্দ—মহিলারা একদৃষ্টে সে মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাদের মুখে কথা সরিল না, বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে তাঁহারা ঠাকুরের অর্চ্চনা করিলেন।

* ইহার বাটী আসাম নওগাঁ, শালমোরা গ্রামে—বয়স ৩৮ বৎসর, আবকারী বিভাগে সুপারভাইজারের কার্য্য করিতেছেন।

শালমোরা গ্রামের কমলচন্দ্র গোস্বামী (স্বরূপানন্দ) ও তদীয় পিসিমা গোলাপসুন্দরী ও ফুলকুমারী ঠাকুরের নিকট সাধনপ্রণালী গ্রহণ করেন। আসামের উচ্চ ব্রাহ্মণপরিবারভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, বাঙ্গালীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করা স্বপ্নাতীত ব্যাপার। কমল যে অবস্থায় ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা অতীব চমকপ্রদ। আমরা কমল গোস্বামীর আসামীভাষায় লিখিত বিবরণের বঙ্গানুবাদ, ১৮ই বৈশাখের "প্রজাশক্তি" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"চারি পাঁচ বৎসর হইল, একদিন রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়···শয়ন করিয়াছিলাম। এমন সময়ে স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাইলাম, কোন সন্ন্যাসী আমার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিলেন 'তোমাকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে—আমার সঙ্গে চল।' আমি কহিলাম 'আমার মা, স্ত্রী ও বিধবা ভগ্নী আছে। আমি গৃহত্যাগী হইলে কে তাহাদের ভরণপোষণ করিবে? আমি তাহাদিগকে এরূপ নিরুপায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিব না।' সন্ন্যাসী কিন্তু আমার কথায় নিরস্ত হইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে কহিলাম 'আপনি যদি আমাকে কেহ না দেখে, এরূপ অবস্থায় নিতে পারেন, তবে আমি যাইতে পারি।' তখন সন্ন্যাসী আমাকে একটী মন্ত্র দিলেন, মন্ত্রের গুণে, অদৃশ্য হইয়া আকাশপথে বিচরণ করা যায়। এ মন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমার দেহ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল।······অবশেষে সন্ন্যাসী আমাকে লইয়া যাত্রা করিলেন। শূন্যমার্গে বিহঙ্গমের মত উড়িতে উড়িতে দুই জনে যাইতে লাগিলাম। প্রাণে আনন্দের ঢেউ

বহিতে লাগিল। শেষে গঙ্গার দক্ষিণপারে আসিয়া, দুই জনে অবতরণ করিলাম। গঙ্গাতীরে অপর একজন তরুণ সন্ন্যাসী যোগস্থ ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। চক্ষু হইতে নীলজ্যোতিঃ ছুটিতেছিল। অঙ্গপ্রভায় চতুর্দ্দিক দীপ্ত হইয়া উঠিল। রাত্রি কি দিন, বুঝিতে পারিলাম না। সেই প্রচণ্ড তেজ, অদ্যাপি আমার মনে আছে। সন্ন্যাসী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুই আসিয়াছিস্?' আমি কহিলাম 'আসিয়াছি সত্য, কিন্তু এখন আমি থাকিতে পারিব না। আমার মা ভগ্নী আছে; আমি চলিয়া আসিলে, ইহাদের প্রতিপালনের জন্য কেহ থাকিবে না। আমি একটী বিবাহ করিয়াছি—স্ত্রীর বয়স অল্প, তাহাকে এখনও গৃহে আনি নাই। আমার পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডদানেরও আমিই একমাত্র অধিকারী। এমতাবস্থায় আমি কি প্রকারে থাকিব?' তার পর সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ কহিলেন 'আচ্ছা এখন তুই যা, চারি বৎসর পর তোকে আসিতে হইবে, আমি নিজে যাইয়া তোকে লইয়া আসিব।'......

এইরূপে নিরাশায় নিরাশায় সুদীর্ঘ সাড়ে চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে এই বিষয়টা এতদিন চাপা ছিল। অল্পদিন হইল আমার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শর্ম্মা, তাঁহার কর্ম্মস্থল শিলচর হইতে বাড়ী আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বলিলাম। তিনি একখানি আলোকচিত্র (Photo) আমাকে দেখিতে দিলেন। সেই ছবি দেখিয়া আমার প্রাণে চমকের একটা বিজলী শিখা ছুটিয়া গেল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—গঙ্গাতীরের সেই যুবক সন্ন্যাসীর অবিকল চিত্র! গোপাল বাবু চমৎকৃত হইলেন

তিনি কহিলেন 'তিন চারি দিন মধ্যেই, সশরীরে এই মহাপুরুষকে দেখিতে পাইবে।' তিন চারি দিন পর, শিষ্যগণ সহ স্বামী দয়ানন্দ আমাদের গ্রামে পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার স্বপ্ন-স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তিনিই গঙ্গাতীরে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী। আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, চারি বৎসর পরে প্রভু অঙ্গীকার মত আসিয়াছেন। সে দিন প্রভু আমার গৃহে শিষ্যগণসহ নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে, আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, জীবনে কখনও ক্রন্দন করি নাই। ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃদেব স্বর্গগত হইয়াছেন, তখনও অশ্রুপাত করি নাই। কিন্তু সেই দিন আমি, মা, পিসীমা, ভগিনী সকলে মিলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলাম। যাইবার সময়, স্বামিজী ফিরিয়া আসিয়া আমার বক্ষে হস্তার্পণ করিলেন—পলকে আমার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—তিন জন্মের কথা জানিতে পারিলাম—জানিলাম, জন্মে জন্মে আমি তাঁহারই দাস।"

কমলচন্দ্র গোস্বামী অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তাঁহার প্রায় সহস্রজন শিষ্য আছে। কমলের ঘটনা শুনিয়া, সমস্ত নওগাঁ জিলায় সাড়া পড়িয়া গেল।

শালমোরা হইতে ঠাকুর গৌহাটী গমন করিয়া কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করেন। ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্ত্তী শুক্লেশ্বরের মন্দিরে একদিন কীর্ত্তন হইয়াছিল; প্রবল ঝড় বৃষ্টি ও পুলিশের আতঙ্ক হেতু, তেমন লোকজন হয় নাই, ফলে গৌহাটীর কীর্ত্তন তত উন্মাদকর হয় নাই। আমরা শালমোরা হইতে আশ্রম-সেবক প্রণবানন্দের নামে যে পত্র লিখিয়াছিলাম,

তাহাতে ঠাকুরের গমনে নওগাঁ অঞ্চলে কিরূপ উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

"......আসামে আসিয়া কি যেন এক আনন্দের সাগরে পড়িয়াছি, ভাষায় তার আভাস দেওয়া অসম্ভব। দলে দলে নরনারী ছুটিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেছে। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে তাঁহাকে নিবার জন্য লোক আসিতেছে। সেদিন গোপাল বাবুর বাড়ীতে কয়েকটী ব্রাহ্মণ-কন্যা আরতি করিয়াছিল, এমন সুন্দর আরতি গান আর কখনও শুনি নাই। তারা যেন ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করিয়াই, আকুলভাবে আরতি করিতেছিল; প্রাণের ভিতর হইতে একটী বিষাদ-স্রোত আসিয়া তাহাদের অমিয় সঙ্গীতধারায় মিশিয়াছিল। এমন ঘন নির্ম্মল আনন্দ, জীবনে আর কখনও পাই নাই। দলে দলে নরনারী পাগল হইয়া ঠাকুরের সঙ্গ লইতে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। পত্র লিখিতেছি, এই সময়ে প্রায় পঞ্চাশজন স্ত্রীলোক শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের গুণকীর্ত্তন করিতেছে, গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা ঢালিয়া দিতেছে। পরিণামে যে কি হইবে ভাবিয়া পাই না—এইতো শুধু হাতে খড়ি! এখানে আমাদেরে সকলেই নিতান্ত আপনার জন ভাবিতেছে। শত বক্তৃতায় যে ভ্রাতৃভাব ফুটিয়া উঠিত না, তাহা মুহূর্ত্তেকে হইয়া যাইতেছে। আমাদের মত অভাজনদিগকেও দেবতার মত সেবা করিতেছে। পলকের পরিচয়েই বুকে টানিয়া লইতেছে।..........ভাই, আমরা পাগল হইয়া উঠিয়াছি। শত শত নরনারী আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। বেদনার সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। আর লিখা অসম্ভব। ভাই, ক্ষমা করিও।"

* * * * *

এই সময়েই ঠাকুরের বিশেষ প্রেরণায় নগেন্দ্রনাথ "প্রজাশক্তি"তে "সংকীর্ত্তন" প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটী এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

কলিতে ইহাপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। নামামৃতরসে পৃথিবীর সমস্ত পাপ, তাপ, গ্লানি, সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, ভ্রাতৃবিরোধ জগৎ অশান্তিপূর্ণ করিয়াছিল—মানুষ আত্মসুখে ব্যস্ত হইয়া, পশুর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধনীর বিলাসভবনের নিম্নে, জীর্ণগৃহে হতভাগিনী, অস্থিচর্ম্মসার শিশুর শেষ নিশ্বাসের সহিত 'মা খাবার দে, মা খাবার দে' কাতররব শুনিয়া, কবাটে মাথা খুঁড়িয়া উষ্ণ রক্তধারায় ললাটে অঙ্গরাগ পরিতেছে। এরা বিলাসলালসায়—লোহিত সুরাপানে উদ্দীপ্ত হইয়া, আমোদে আত্মহারা হইয়া, বীভৎস চীৎকার করিতেছে; আর এদিকে হতভাগিনী মৃত শিশুকে বক্ষে আঁকড়াইয়া আকাশ ফাটাইয়া হাহাকার করিতেছে—ললাটের রক্তস্রোতে অশ্রুপ্রবাহ মিশিতেছে। ভগবন্, ভগবন্, তুমি কোথায়? এই নরকের দৃশ্য দেখাইতেই কি পৃথিবীতে আনিয়াছ? তোমার নরক—সে তো ভাল, নরকে নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা আছে, কপটতা নাই—কেবল যন্ত্রণা—যন্ত্রণা—যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণায়ও সরলতা আছে—নীচ, মলিন, সঙ্কীর্ণ কপটভাব নাই। সেথায় রক্তাধরের অন্তরালে হলাহল নাই—ভুবনমোহিনীর যৌবনলাবণ্যের আড়ালে পিশাচিনী

বিরাজ করে না। সেখানে উৎপলনীল চক্ষুতে গরল উথলিয়া উঠে না—অমিয়দুগ্ধপূর্ণস্তনযুগলে বিষলেপ থাকে না।

ধরা পাপপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—যন্ত্রণার সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—যে দুই একজন ভগবদ্ভক্ত আছেন, তাঁরাও ধরার তুলনায় নরককে স্বর্গ বলিয়া তাহার আশ্রয় লইতে চায়। এমন সময়ও কি তোমার বিকাশ হইবে না? যুগে যুগে এমনি সময়ে তুমি আবির্ভূত হইয়া, পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। বৈকুণ্ঠ হইতে গোপীভাব আনিয়া ব্রজধামে প্রেমতরঙ্গিনী সৃজন করিয়াছিলে—পৃথিবীর বাতাস তাহার শিকরকণা বহন করিয়া ধন্য হইয়াছিল; প্রেম ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবারও ধর্ম্মের গ্লানির চরম অবস্থা—জগন্ময় পাপ, প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

শোক-তাপ-জর্জ্জরিত কোটিকণ্ঠের বেদনার ধ্বনি তাঁহার সিংহাসনে পৌঁছিয়াছে—তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত প্রেম সলিল সঞ্চালিত করিয়া তুলিয়াছে—আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। অপার অসীম নিলীমা হইতে শান্তি লইয়া, কোটি চন্দ্রমা হইতে স্নিগ্ধ করুণা লইয়া, কোটি প্রস্ফুট পুষ্পবন হইতে হাসি ও আনন্দ লইয়া সেই শান্তিস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ আসিয়াছেন—তিনি আজ সংকীর্ত্তনরঙ্গে বিশ্ব মাতাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সংকীর্ত্তনেব প্রভু আসিয়াছেন বলিয়াই আজ সংকীর্ত্তনরঙ্গে দেশ মাতিয়া উঠিতেছে—দেশ দেশান্তরে সেই স্রোত প্রবাহিত হইবে—ভারত হইতে প্রেমতরঙ্গ নাচিতে নাচিতে দশদিকে ছুটিতেছে।

সংকীর্ত্তন আমাদের জাতীয় জীবনে প্রেম, একতা, ভ্রাতৃভাব ফুটাইয়া

তুলিবে, সংকীর্ত্তন সমস্ত বিশ্ববাসীকে প্রেমের হেমসূত্রে বাঁধিয়া ফেলিবে। জগৎ হইতে ভেদ বিবাদ, শোক দৈন্য দূর করিয়া দিবে—মধুর মঙ্গলোজ্জল প্রেমরস প্রাণে প্রাণে ঢালিবে। যাহাকে ছুঁইতে ঘৃণা করিত—যাহার সহিত মিলিতে সঙ্কোচ বোধ করিত—সংকীর্ত্তনরঙ্গে অধীর হইয়া লোকে তাহাকেই নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতেছে—অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রও সে প্রেমাশ্লেষে বাধা দিলে অসহ্য বোধ হইতেছে। যাহার অন্ন আহার করিতে সঙ্কোচ হইত না, তাহার পাতের প্রসাদ অমৃতজ্ঞানে ভক্ষণ করিতেছে। সংকীর্ত্তন আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও জাগতিক জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিব। এই সংকীর্ত্তনরসে মত্ত হইয়া লোকে পরপরিবারে, স্বগৃহের লোকের মত মিলিতে পারিতেছে—বহুদিনের বন্ধুর সঙ্গে যে ভাবে কথা বলিতে, যেরূপ ভাবে মিলিতে পারিত না—সেভাবে আজ তাহাদের সাথে মিলিতে পারিতেছে—এক মুহূর্ত্তের পরিচয়ে জানুতে মাথা রাখিয়া শুইতে পারিতেছে। লোকে ইন্দ্রজাল বলিয়া রব তুলিয়াছে—দেখুক আজি বিশ্ববাসী, কোন কুহকে এমন আশ্চর্য্য সংঘটন হয়—পলকে নরনারী সহোদর ভ্রাতাভগিনীর মত হইয়া যায়—হরিনাম মহামন্ত্র কলিযুগে অসম্ভব সম্ভব করিবে।

আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরে, স্বামী চিদানন্দ কতিপয় ভক্তসহ বানিয়াচঙ্গ গ্রামে গমন করেন। বানিয়াচঙ্গ শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রাম—অধিবাসীর সংখ্যা ত্রিশ হাজারের অধিক হইবে। বহু শিক্ষিত ভদ্র-ব্রাহ্মণের বাসভূমি। প্রায় সকলেই শাক্ত—গৌর নিতাইর নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। সেই বানিয়াচঙ্গ

গ্রামে স্বামী চিদানন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কীর্ত্তনে এক অপার অলৌকিক শক্তির বিস্তার হইল। এক দিনের কীর্ত্তনে ৭০।৭৫ জন লোক ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভগবানের এমনি লীলা—যাঁহারা যাঁহারা ঠাট্টা করিবার উদ্দেশ্যে আসিতেন, তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের ধ্বনিতে না জানি কি এক সম্মোহিনী শক্তি নিহিত ছিল—অন্তঃপুরে রমণীগণ—মাতৃক্রোড়ে শিশুগণও সে ধ্বনি শুনিয়া বিলুপ্ত-চেতন হইল। হিন্দু মুসলমান সকলেরই মুখে চিদানন্দের কথা—কল্পনাতীত কীর্ত্তনের কথা। পাড়ায় পাড়ায় নরনারী, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" গাহিতে লাগিল—মাঠে মাঠে রাখালেরা "প্রাণ গৌর" রব তুলিল। স্বামী চিদানন্দকে একজন অসামান্য শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া সকলে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। তখন সকলে চিদানন্দের গুরুকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বহুলোকের কাতর আহ্বানে বানিয়াচঙ্গ গ্রামে আসিলেন—দ্বিগুণতর উৎসাহে কীর্ত্তন চলিল—শত শত নিন্দুক বিরুদ্ধবাদী, কীর্ত্তন-মণ্ডলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। যাহারা কোনও কালে তাহাদের ভাব হইবে না বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে আসিয়াছিল, তাহারাই বিশেষ ভাবে ভাবগ্রস্ত হইয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল। অমাবস্যা রাত্রে আশ্রম-সেবক শঙ্করানন্দ* প্রভৃতির উদ্যোগে, কালীবাড়ীতে এক বিরাট কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রায় সহস্রাধিক লোক যোগদান করে। সে দিনের কীর্ত্তনের আবেগে—আনন্দে—উত্তেজনায়—নরনারী উন্মত্তবৎ—

* নাম জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, নিবাস বানিয়াচঙ্গ গ্রামে—বয়স অনুমান ৪০ বৎসর—গ্রামে থাকিয়াই ডাক্তারি ব্যবসায় করিতেছেন।

হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি দিব্যসৌন্দর্য্যে বিভাসিত হইয়া লোকসঙ্ঘে দীপ্তি পাইতেছিল। সহসা আকাশ হইতে একটী ক্ষেমঙ্করী নক্ষত্রবেগে তাঁহার চরণোপরি পতিত হইল—তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে শ্রীপাদে একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সিন্দুর বর্ণ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া, মুহূর্ত্ত পরেই উড়িয়া গেল। এইরূপে বানিয়াচঙ্গ গ্রামে হরিপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিয়া ঠাকুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

আষাঢ় মাসে নিমন্ত্রিত হইয়া কুমিল্লা সহরে ১৪।১৫ জন শিষ্যসহ গমন করেন। কুমিল্লাতে সপ্তাহব্যাপী কীর্ত্তন হইয়াছিল। রথযাত্রার দিবস রাজপথের উভয়পার্শ্বে, কাতারে কাতারে লোক রথ দেখিতে চলিয়াছিল ; মধ্যদেশে বহু অধিবাসী দ্বারা রচিত একটী বিচিত্র শোভা-যাত্রা—অগ্রে ঠাকুর চলিয়াছেন—বামপার্শ্বে স্বামী চিদানন্দ—উভয়ের গলদেশে পুষ্পহার—মুখে অপার মাধুর্য্য। কীর্ত্তন করিতে করিতে, সকলে জগন্নাথ-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—মন্দিরে তুমুল আরাবে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

কুমিল্লা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যতীত অপর সকলেই শ্রীহট্ট গিয়া-ছিলেন—ঠাকুরও টেলিগ্রাম পাইয়া কিছুদিন পরে, শ্রীহট্টে ভক্তগণের সহিত মিলিত হন। অবিরাম বৃষ্টির জন্য সেখানকার কীর্ত্তনে তেমন সুবিধা হয় নাই।

ভাদ্র মাসে ঠাকুর কীর্ত্তন ও প্রচারোদ্দেশ্যে কিশোরগঞ্জে গমন করেন ; কিশোরগঞ্জে মহাউচ্ছ্বাসময় কীর্ত্তন হইয়াছিল—শত শত লোক নামামৃত পানে বিভোর হইয়া উঠেন। এমন কীর্ত্তন কেহ কখনও শুনেন নাই ; শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পর কীর্ত্তনে এমন অপার

প্রেম ও দিব্যোন্মাদ দৃষ্ট হয় নাই, লোকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল। কিশোরগঞ্জের কীর্ত্তনে ডাক্তার সত্যেন্দ্রনারায়ণ রায়* (কালিকানন্দ)—দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী (অঞ্জনানন্দ)† প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহাদের প্রাণেরদেবতা রূপে উপলব্ধি করেন। রাত্রি দিন ঠাকুরকে দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিতে, শত শত লোক আসিত। ঠাকুরের বাসস্থান শ্যামসুন্দরের আখড়াবাটী সর্ব্বদা লোক-কোলাহলে মুখরিত থাকিত। কেবল তাঁহাকে দেখিবার জন্য ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে লোক আসিতে লাগিল।

কিশোরগঞ্জে একটী বিষাদজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বামী হংসানন্দের একজন নিকট সম্পর্কিত আত্মীয় তাঁহাকে বাটী নিতে আসেন—তিনি অস্বীকৃত হইলে সেই ভদ্রলোক, ছত্রদ্বারা তাঁহার তরুণ অঙ্গে প্রহার করিতে লাগিলেন—শরীর হইতে রক্তধারা ঝরিতে লাগিল—হংসানন্দ নীরব—নিস্পন্দ—ধ্যান-মগ্ন। এই দৃশ্যে অনেকের প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল—তাহারা সেই ভদ্রলোককে সমুচিত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলে, ঠাকুর ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। তাহারা তখন নিরুপায় হইয়া, মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শুনিলাম ভদ্র-লোকটী বাড়ী যাইয়া, এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট ক্রন্দন ও অনুশোচনা করিয়াছিলেন।

কিশোরগঞ্জ হইতে ঠাকুর বনগ্রাম গমন করেন। সেখানে ৪।৫ দিন

---

* নিবাস কিশোরগঞ্জ নগুয়া পল্লীতে—বয়স ৩৫ বৎসর। সম্প্রতি ডাক্তারি ব্যবসায় ছাড়িয়া আশ্রমবাসী হইয়াছেন।

† ইহার বাসস্থানও কিশোরগঞ্জ—নগুয়া পল্লীতে—বয়স ২৮ বৎসর—বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন।

ব্যাপিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন দর্শনে সহস্র সহস্র নরনারী বিস্ময় ও আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

ঠাকুর যে স্থানে পদার্পণ করেন, সেই স্থানেই যেন একটা নূতন পুলককল্লোল বহিতে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার মধ্যে, যেন একটা অজানা দেশের আনন্দ ও সরসতা মিশিয়া যায়।

বনগ্রাম হইতে দীঘদাইর সত্যগোপাল ঠাকুরের আখড়াতে, শ্রীযুক্ত অবনীসাধুর বর্ষব্যাপী অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন দর্শনে গিয়াছিলেন—কেন জানি না, তথায় ঠাকুরের বহু চেষ্টাতেও কীর্ত্তনে তেমন প্রেম হয় নাই।

দীঘদাইড় হইতে জয়কা গমন করেন। জনৈক জমিদার ঠাকুরকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। জয়কাতে কীর্ত্তনে অসীম আনন্দ হইয়াছিল—৩০।৪০টী লোক ভাবাবিষ্ট হইয়াছিল। সেদিন প্রেমপ্রমত্ত হইয়া প্রতাপশালী জমিদার ও নিরীহ ভয়কম্পিত প্রজা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নৃত্য করিয়াছিল—ব্যাঘ্র ও হরিণ এক সাথে নৃত্য করিয়াছিল। সেদিন ঠাকুরের অঙ্গে অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ঠাকুর গাঢ় ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া "মাল্যং দেহি, মাল্যং দেহি" রবে পুষ্পমালা চাহিলেন। সময়মত মালা আসিল না—যখন আসিল তখন ভাব ছুটিয়া গিয়াছে;—ঠাকুর মাল্যগ্রহণ করিলেন না। ভাবাবিষ্ট লোকদিগকে স্কন্ধে বহিয়া একস্থানে সারি সারি শায়িত রাখা হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার বাটীর সঙ্গে সে বাটীর লোকদের ভীষণ শত্রুতা ছিল; এক বাড়ীর লোক অন্য বাড়ীতে বহুদিন পদার্পণ করেন নাই, কিন্তু সেদিনের কীর্ত্তনের প্রেমোচ্ছ্বাস শত্রুতার পাষাণ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া

ছুটিয়াছিল। উভয় পরিবারের লোক সরলপ্রাণে পরস্পরকে বুকে জড়াইয়া "প্রাণ গৌর" গাহিয়াছিলেন।

তৃতীয়বারের উৎসব মহাধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল—বঙ্গদেশ ও আসামের সুদূর প্রান্ত হইতে অনেক ভদ্রলোক উৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্বে, বরিশাল নরোত্তমপুরবাসী, কৈলাসহর হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয়-শিষ্য, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসু রায় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসী হন। নানাদেশবাসিনী অনেক মহিলা ও ঠাকুরের পরিবারস্থ সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। গেরুয়া-পরিচ্ছদ-শোভিত শতাধিক ভক্ত, উৎসবের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য দলে দলে স্থানে স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আশ্রমশৈলের পাদদেশে দুই সপ্তাহের জন্য ট্রেণ্ থামাই-বার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; শ্রেণীবদ্ধভাবে পীতবসনধারী ভক্তগণ, অরুণাচল-যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিতেন। কর্ম্মিদের মুখে অপার আনন্দ ও উৎসাহ—যন্ত্রবৎ যে যার কার্য্য করিয়া যাইতেছে।

উৎসবের দিন প্রায় ৮।১০ হাজার লোকে মিলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিল। মধুর হাস্যচ্ছটায়, গগনভেদী "প্রাণ গৌর" রবে, মৃদঙ্গ করতালের মদিরমন্দ্রে, দূরদূরান্তের শৈলশ্রেণীও মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন নীল-শৈল-প্রাচীর-বেষ্টিত মা আনন্দময়ীর পুরী, আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

উৎসবের পরদিবস প্রভাতে, কীর্ত্তনে একটী মহাশক্তি বিকশিত

হইতে লাগিল—সকলে থরথরি কম্পমান হইয়া ঠাকুরের পদতলে পতিত হইতে লাগিল; অপরদিকে আশ্রমঘরে মহিলাগণ উন্মাদিনীবৎ "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" ধ্বনি তুলিলেন। কেহ বা মূর্চ্ছিতা হইলেন, কেহ বা আছাড়িয়া পড়িতে লাগিলেন; চন্দ্রোদয়ে সাগরাম্বুর মত, একটা ক্ষিপ্ত প্রেমোচ্ছ্বাস প্রবলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল—সকলে প্রমাদ গণিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ঠাকুর, সেই বিকাশোন্মুখ মহাশক্তিকে সংহত করিয়া, মার মন্দিরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিলেন।

শত শত লোক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য, দরজা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল—অভয়ানন্দ * প্রমুখ ভক্তগণ বহুকষ্টে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে লোকসঙ্ঘ কথঞ্চিৎ প্রশান্তভাব ধারণ করিলে, ঠাকুর বাহিরে আসিলেন; তখনও আশ্রম-ঘরে মহিলারা উন্মত্তবৎ মূর্চ্ছিত ও লুণ্ঠিত হইতেছিলেন—লজ্জা সরমের উপরে উঠিয়া "প্রাণ গৌর" রবে নৃত্য করিতেছিলেন। ঠাকুর তাহা-দিগকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে, নবদ্বীপের জয়নিতাই সহ সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রমণীগণ ঠাকুরকে দেখিবামাত্র, ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে পতিত হইতে লাগিলেন—তাঁহাদের ললাটের সিন্দূরে ঠাকুরের চরণযুগল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সেই দিনই স্নানান্তে, একজন ভক্তের নিকট ঠাকুর বলিয়াছিলেন "আজ আর দেখিয়াছিস্ কি? এমন দিন আসিতেছে—যেদিন পশুপক্ষীরাও আসিয়া মানুষের সহিত কীর্ত্তনে যোগ দিবে।" এই যুগে কীর্ত্তনে যে কিরূপ

* ইহার নাম দেবেন্দ্রনাথ দে—বাড়ী ময়মনসিংহ গোপদীঘি গ্রামে। আশ্রমে যোগ দিবার পূর্ব্বে তিনি ওকালতী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বয়স ২৮।২৯ বৎসর।

কল্পনাতীত ব্যাপার সংঘটিত হইবে, ঠাকুর এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বেও তাহার আভাস দিয়াছিলেন। স্বামী চিদানন্দের "সাধনবিবরণী" হইতে আমরা নিম্নের অংশটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"চিদানন্দ। কাল স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমি ছুটিয়াছি—আর পাছে পাছে অসংখ্য লোক হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া ছুটিয়াছে—পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে যোগ দিতেছে—আর আমরা এত মাতোয়ারা হইয়া ছুটিয়াছি যে, মাটীতে পা ছোঁয় না।

ঠাকুর। আমার বিশ্বাস শীঘ্রই সে দিন আসিতেছে।"

আমরা শ্রীযুক্ত লাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তীর লিখিত, ২৫শে চৈত্রের "বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত, একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"·····কি দেখিলাম? দেখিলাম জলে যেমন তরঙ্গ উঠে, তেমনি কীর্ত্তনে ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তনে এরূপ তরঙ্গ উঠিত শুনিয়াছি, তবে ইহা একটা কথার কথা বলিয়া ধরিতাম, কবির অতিরঞ্জিত বর্ণনা বলিয়া বুঝিতাম। এখন আমার সে ভ্রান্তি গিয়াছে। ভাবের তরঙ্গ আমি অনুভব করিয়াছি।······আর কি দেখিলাম? দেখিলাম ভাব-মদিরাপানে মাতাল দয়ানন্দ, একবার এদিকে, একবার ওদিকে, পায়চারী করিতেছেন। দেহকান্তিও চন্দ্রমারশ্মিতে অভেদ হইয়া গিয়াছে। কবির ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়—সুধাকরও যেন এ দিব্যমূর্ত্তির কাছে ম্লান হইয়া পড়িয়াছেন—মূর্ত্তিখানি এমনই মনোহর। উপস্থিত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে, এ মূর্ত্তিখানি যে কেহ বাছিয়া নিতে পারিয়াছেন।······আর কি দেখিলাম? কুঞ্চিত-

কুন্তলদাম-পরিশোভিত শ্যামমূর্ত্তি যুবক-ব্রহ্মচারী স্বামী চিদানন্দ। কথা শুনিলাম—যেন ব্রজবালকের বেণুধ্বনি। আর কি দেখিলাম—সেই পবনের মত উদার, প্রেমানুরাগরঞ্জিত, স্বনামধন্য গোস্বামী শ্রীশ্রীদেবেন্দ্রনাথ ও নকুলাবধূত। আর কি দেখিলাম? শরশয্যাশায়ী সন্ন্যাসী হরিদাস। সর্ব্বোপরি, তাঁহার কথাগুলি এত মিষ্ট যে, কাণ পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়। আরও কত ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ও বিভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তের দল দর্শন করিলাম—নিজে ধন্য হইলাম। দিবারাত্রি পান ভোজনের বিরাট ব্যাপার; আদর অভ্যর্থনার একশেষ। এইরূপ সুবন্দোবস্ত বহু সঙ্গতিশালী লোকেরও সাধ্যাতীত। স্বামীজি ত্যাগ-ভোগের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটী বিষয় কিরূপে একত্র সম্ভবে তাহা, এই বিরাট উৎসব যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। আর দেখিলাম শ্রীহট্ট, কাছাড, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, পাবনা প্রভৃতি জেলার বহুসংখ্যক যাত্রী। অরুণাচল মহাতীর্থস্থলী মনে করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন। আশ্রমের ধূলি মহাপবিত্রজ্ঞানে আত্মীয়বর্গের জন্য সংগ্রহ করিতেছেন। আর দেখিলাম—শত শত লোকের ভাবাবেশে ধূলায় গড়াগড়ি, আনন্দে নৃত্য, অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি ভাবের বিকাশ।

আহা কি চমৎকার দৃশ্য! সহসা দেখিলে মনে হয়, যেন একদল মাতাল তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, উন্মাদের মত এদিকে ওদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ভাবে গড়াগড়ি দিতেছে, তাহাদের পদভরে মেদিনী যেন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। কেহ বা—

"এস হে প্রাণের গৌর, প্রেমানন্দে হয়ে বিভোর,
মাতাও জগৎজনে নামকীর্ত্তনে।"

বলিতে বলিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বেশ মনে হইল—

"আমার গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
নামেতে পাষণ্ডদলন, ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।"

আশ্রমবাসী বা দর্শক, প্রত্যেকেই, নাম-কীর্ত্তনে বা শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক এই দৃশ্যটী একবার কল্পনা কর।

তারপর কি দেখিলাম? দেখিলাম—অচলের সম্মুখ দিয়া ক্ষীণকায়া হৈমন্তিক বরবক্র, কৃশাঙ্গী বালিকার মত দক্ষিণাভিমুখে, মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। উপরে নীলাকাশ! বক্ষে নীলজল! পূর্ণিমার সুধাকর আকাশের কোলে বসিয়া সুধাধারাবর্ষণে জগৎ প্লাবিত করিতেছেন। মৃদুমন্দ সমীরণ, পর্ব্বতের শ্যামায়মান তরুশাখাগুলি দোলাইয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই রবে ছুটিয়াছে—আর দর্শকবৃন্দের প্রাণ, উদাসীনতার দিব্য প্রেরণায় নাচাইয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে নীলিমারঞ্জিত কাছাড়ের পাহাড়। সকলেই যেন কাণ পাতিয়া, কীর্ত্তনের মধুর তান পান করিতেছে।

তাই স্থাবর জঙ্গম ধীর গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিয়াছে। আহা মরি কি দৃশ্য! অচলে শ্যামা মায়ের মৃণ্ময়ী চিন্ময়ীমূর্ত্তি। অন্তরে শ্যামা, বাহিরে শ্যামা, আকাশে শ্যামা, জলে শ্যামা, স্থলে শ্যামা, শ্যামা শ্যামে অভেদ। মা তোর বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ ধারণা কি বর্ণনা করা, মাদৃশ দীনজনের পক্ষে অসম্ভব। আমার ক্ষুদ্র আধার টলমল।

আর কি দেখিলাম? দেখিলাম ভক্তবৃন্দের আনন্দের নৃত্য। সে

নৃত্যতরঙ্গ তদীয় গণ্ডী ভঙ্গ করিয়া স্ত্রী-মহলে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জার বাঁধ দিতেছেন, কিন্তু এ প্রবল স্রোত রোধ করে কার সাধ্য? বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঢেউ ছুটিল, ক্ষুদ্র তরঙ্গ ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করিল। তারপর কি হইল? বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কুলবধূ, অনেক যুবতী, বৃদ্ধা, অনূঢ়া বালিকা ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল—"প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" উচ্চতানে দিঙ্মণ্ডল বিধূনিত করিয়া তুলিল। সামাল সামাল ডাক পড়িল। কে কাবে সামলায়? অবশেষে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আশ্রমঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল সেই "নদের খেলা, ধূলায় গড়াগড়ি।" স্বয়ং স্বামিজী আকুলাবেগে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের উচ্চ রোল গগনমণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিল। তরুলতা, ফুলফলও যেন "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" বলিতে বলিতে, অবিরল প্রেমাশ্রু জল বিসর্জ্জন করিয়া নিত্যানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মানুষেরতো কথাই নাই। কেহ কেহ ভাবে গড়াগড়ি। কাহারও বা ভাবমদিরাপানে—ঢুলু ঢুলু আঁখি। কেহ কেহ চলিতে চলিতে. হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে। আগাগোড়া না বুঝিলে মনে হয়, এক এক পিপা মদ খাইয়া এরূপ ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ প্রবল প্রেম-তরঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বামিজীর ইঙ্গিত মাত্রেই দমিয়া গেল। প্রবল ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ মহাসাগর, চক্ষের পলকে অতি প্রশান্তভাব ধারণ করিল। এই বিশ্বপ্লাবী প্রেম-তরঙ্গের প্রথম সবল উচ্ছ্বাস, কোন মহাশক্তির কটাক্ষে মুহূর্ত্তে দমিত হইল, তা' দয়ানন্দ তুমিই জান।

আর কি দেখিলাম? আর কি শুনিলাম? দেখিলাম—শ্রীচৈতন্যের সেই যবন হরিদাস, দয়ানন্দের শরণাগত। সরাফত*—প্রেমবিভোর সরাফত (নির্ম্মলানন্দ), গেরুয়া-পরিহিত, ভক্তপ্রবর সরাফত; কীর্ত্তনের মাঝখানে দেখিলাম, দয়ানন্দের উদারবক্ষে—ভাবাবিষ্ট সরাফত। নিশান্তে, ভৈরবীরাগিণীতে, ভক্তিমাখাসুরে, তানপুরাসহযোগে, শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। সে গান "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" আর দেখিলাম, স্থানীয় শত শত লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে, ভিন্ন ভিন্ন পথে কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া "বলে দেরে নগরবাসী, মধুর বৃন্দাবন কত দূরে" প্রভৃতি গান গাহিতে গাহিতে, পঙ্গপালের মত আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। স্তব্ধ দুপুর—কীর্ত্তন-ধ্বনিতে যেন ঝম্ ঝম্ করিতেছে। ....আজ আবার বহুদিনের কথা মনে পড়িল :—

"শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়।"

উৎসবান্তে ঠাকুর অর্দ্ধশতাধিক ভক্তসহ, অন্তেহরি গ্রামে যাত্রা করেন। একজন চম্পকবর্ণ ব্রাহ্মণ-কুমার, দেশে দেশে নামামৃত বিতরণ করিতে চলিয়াছেন—সঙ্গে পঞ্চাশাধিক ভক্ত—সকলেই সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান, পরম উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া যাইতেছেন; প্রতি মুখ হইতে প্রেম, আনন্দ, হাসি উছলিয়া পড়িতেছে; পথে পথে সহস্র সহস্র লোক এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইলেন। ভারতের ইতিহাসে এইরূপ গৌরবোজ্জ্বল চিত্র অতীব বিরল।

---

* ইহার বাড়ী ত্রিপুরা জেলার বিদ্যাকুট গ্রামে, বয়স অনুমান ৪০—ইনি একজন প্রসিদ্ধ বাদক ও গায়ক।

করিমগঞ্জে রাত্রি অবস্থান করিয়া, পরদিন সন্ধ্যাবেলা ঢাকা-দক্ষিণ মহাপ্রভুর বাটীতে সকলে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর বাড়ীর নাটমন্দিরে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হয়। উৎসাহ, উন্মাদনার একশেষ হইয়াছিল।

পরদিবস প্রভাতকালে ঠাকুর, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রাচীন বাটীর ভগ্নাবশেষ দর্শনে গিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের অঙ্গে প্রগাঢ় ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চলভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে শায়িত হইলেন।

ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামের শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার মিশ্র প্রমুখ ভক্তগণ, পরম সমাদরে ঠাকুরের অভ্যর্থনা ও উপদেশাদি গ্রহণ করিলেন। ঢাকা-দক্ষিণ হইতে অস্তেহরি গমন করেন। সেখানে দুই দিবস অবস্থানের পর, শ্রীশ্রীঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমঙ্গল গ্রামে যাত্রা করেন।

মৌলবীবাজার আসিয়া পৌছিলে, তথাকার স্থানীয় লোক, এক কীর্ত্তনের দল লইয়া, নদীতীরে ঠাকুরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বিবিধ বর্ণের পতাকা ও গ্যাসের আলোকে সেই দলটী অতি রমণীয় দেখা গিয়াছিল। কীর্ত্তন-সম্প্রদায় দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া, সশিষ্য ঠাকুর দ্রুতবেগে সেই দলে গিয়া মিশিলেন। মুন্সেফী কাছারীর প্রাঙ্গণে তুমুল কীর্ত্তন চলিল ; আকাশবিদারী "প্রাণ গৌর" রবে সহর প্রকম্পিত হইয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে মৌলবীবাজারে কীর্ত্তন হইয়াছিল—স্থানীয় গণ্যমান্য বহু সম্ভ্রান্ত লোক, কীর্ত্তন শ্রবণ ও ঠাকুরের সঙ্গে আলাপাদি করিতে আসেন। বিকাল বেলা শ্রীমঙ্গল রওয়ানা হইলেন।

উত্তরসুর গ্রামে দু'দিন প্রবল-উচ্ছ্বাসময় কীর্ত্তন হইয়াছিল। একজন মুসলমান প্রেমাবেশে প্রমত্ত হইয়া, কীর্ত্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে সকলকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামী হংসানন্দ কীর্ত্তনস্থলীতে, অপূর্ব্বভঙ্গী সহকারে কতিপয়ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বরাভয়-দায়িনীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনে অপার শক্তির বিস্তার হইয়াছিল। এদিকে ওদিকে কত লোক, ভাবাবেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিল। কাহারও কাহারও মুখ হইতে ফেন ও লালা নির্গত হইতেছিল। কীর্ত্তনস্থলীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি লুপ্তচেতন লোকগণে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া গ্রামস্থ লোকেরা, যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে স্তম্ভিত হইয়াছিল।

তীর্থযাত্রা প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী অবস্থা —'অমৃত" কবিতা।

ঠাকুর কয়েক ' বৎসর পূর্ব্বেই ভক্তগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাকে একবার হরিদ্বারে যাইতে হইবে। মাঘ মাসের শেষভাগে তিনি বিমলানন্দকে সঙ্গে লইয়া হবিগঞ্জ যান। পথে প্রকাশ করিলেন, হবিগঞ্জ হইতেই তীর্থযাত্রা করিবেন।

৩রা ফাল্গুন, বিমলানন্দকে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। কুমিল্লাস্থ ভক্তবৃন্দের অনুরোধে, সেখানে একদিন থাকিয়া, পরদিন রাত্রের ট্রেণে হরিদ্বারের টিকেট করিয়া যাত্রা করিলেন। ৭ই ফাল্গুন প্রভাতে, কাশীধাম পৌছিলেন। সেখানে দুদিন ছিলেন। বিশ্বেশ্বর দর্শনে গিয়া, ভাবস্থ অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র গান রচনা করেন :—

ওহে বিশ্বেশ্বর ভোলা হর, ভুলিয়ে রয়েছ তুমি।
ভুল ভাঙ্গিতে—এসেছি কাশীতে, ভুলিতে দিব না আমি ॥
কাশীধামে তুমি আছ বাঁধা হয়ে,
পড়ে না কি মনে আন দেশ ভয়ে,
পাঠালে যে দেশে, অধম এ দাসে,
প্রচারিতে অন্তর্য্যামী ॥*

কাশী হইতে ৯ তারিখ অযোধ্যা যাত্রা করেন। সেখানে শ্রীরাম-চন্দ্রের জন্মস্থান, রাজগদি, দশরথভবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরদিন

* ইহাই ঠাকুরের প্রথম রচনা—তিনি পূর্ব্বে কখনও কবিতা রচনা করেন নাই।

হরিদ্বার রওয়ানা হইলেন। ১১ তারিখ প্রাতে হরিদ্বারে পৌছিলেন। হরিদ্বারে গঙ্গার দৃশ্য বড়ই মনোরম; সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ঠাকুর ভাবে আত্মহারা হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ ভাবস্থ অবস্থায় ছিলেন। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত গানটী রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন :—

নমো মাতঃ গঙ্গে, বড় যে তরঙ্গে,
খেলিছ রঙ্গে হরিদ্বারে।
বুঝি পেয়ে হরি, রেখেছ গো হরি'
মিশায়ে তরঙ্গ মাঝারে॥
ছেড়ে দিতে হবে প্রাণেশ্বর হরি,
আর কতকাল রাখিবে গো হরি';
রাখ যদি, রোষে—ডাক্‌বো আশুতোষে,
ভাঙ্গিব তোমার ভারিভূরি॥

পরদিন প্রত্যূষে হৃষীকেশ যাত্রা করেন। তথা হইতে দ্বিপ্রহরে লছমন্‌ঝোলা রওয়ানা হইয়া, সন্ধ্যার সময় একাযোগে ফিরিয়া আসেন।

১৩ই ফাল্গুন অপরাহ্নে, কুরুক্ষেত্র যাত্রা করিয়া রাত্রে থানেশ্বর ষ্টেশনে পৌছিলেন। পরদিন লক্ষ্মীকুণ্ড, ব্রহ্মসরোবর, থানেশ্বর মহাদেব, বাণগঙ্গা, ভীষ্মের শরশয্যা, অভিমন্যুর চক্রব্যূহ, সংগ্রামস্থল প্রভৃতি দর্শন করেন। যে বটবৃক্ষতলে ভগবান, অর্জ্জুনকে গীতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সে বৃক্ষটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া ঠাকুর যারপরনাই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তীর্থস্থানগুলির বর্ত্তমান অবস্থা,

স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া তিনি বড় হতাশ হইয়াছিলেন। অনেকস্থলেই মানুষের হস্তে প্রাচীন কীর্ত্তির বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে ; নানারূপ বিকৃতি এবং কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল—তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেছিলেন।

কুরুক্ষেত্র হইতে যাত্রা করিয়া, ১৫ই তারিখ প্রভাতে শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছিলেন। এস্থানটিও কৃত্রিমতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত পরিতাপ প্রকাশ করেন। পাণ্ডা ও সেবায়েৎদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, তাঁহাকে অনেক স্থলেই নিতান্ত অপ্রিয় ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার নির্ভীক—ওজঃপূর্ণ ভাব দেখিয়া, অনেকেই তাঁহার নিকট অবনত হয়। এখানেও একটি গান আসিয়াছিল। গানটী এই :—

প্রভো, পারি না আমি আর সহিতে ;
তোমারি বিরহে, সদা হিয়া দহে,
পারি না ধৈরয ধরিতে।
খুঁজে খুঁজে আমি এলেম বৃন্দাবন,
কোথা র'লে তুমি বৃন্দাবনধন,
দেখা দিয়ে জুড়াও তাপিত জীবন,
নৈলে জীবন দিব (আজ) জীবনেতে ॥

বৃন্দাবন হইতে মথুরা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি দর্শনান্তে, এলাহাবাদ হইয়া কাশী ফিরিয়া আসেন। সেখানে ৫ দিন থাকিয়া, ২৬শে তারিখ বৈদ্যনাথ পৌঁছিলেন। বৈদ্যনাথ হইতে রওয়ানা

হইয়া দোল-পূর্ণিমার দিন হবিগঞ্জ এবং তথা হইতে সপ্তাহেক পরে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন।

তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, ঠাকুরের জীবনে একটি বিষম পরিবর্ত্তন আসিল। সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ হইল, ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকে আশ্রমবাসী হইতে লাগিলেন*—নানাস্থানে নানা ভাবে আশ্চর্য্যরূপে শক্তির ক্রিয়া হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই যথার্থরূপে তাঁহার আত্মপ্রকাশেরও সূচনা হইল। অরুণাচলের ইতিহাসে ইহা যুগান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(১২ই চৈত্র) একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর আমাদের কয়েকজনকে নিয়া আশ্রমে আসিলেন। শিলচরবাসী ভক্তগণ প্রায় সকলেই সেদিন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। মার মন্দিরে আরতির গান ধরা হইল—

"আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁহারি ভকত মন্দিরে………"

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে মাতৃভাবে আবিষ্ট হইলেন, প্রতি অঙ্গে মনোহর লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল, কৃষ্ণকেশজাল পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িল, চক্ষের পলকে, বায়ুচালিত বস্ত্রখণ্ড বক্ষোপরি স্তনাকারে কাঁপিয়া উঠিল, অপূর্ব্ব-ভঙ্গীসহকারে—এক পদ পশ্চাতে, অপর পদ সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, সিংহবাহিনী বেশে দাঁড়াইলেন। সকলে তখন আনন্দে আত্মহারা

* আশ্রমের কার্য্যে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারস্থ মহিলা-বর্গ, ধর্ম্মপ্রাণতাহেতু আশ্রমবাসের উপযুক্তা বিবেচিত হইলে, আশ্রমে তাঁহাদের থাকিবারও ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে অধ্যক্ষ, স্বামী চিদানন্দের ভ্রাতারা ও পরিবারের মহিলাবর্গ এই ভাবে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হইয়া, তাঁহাকে ঘেরিয়া আরতি-সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। সঙ্গীত থামিলে, আমরা মার ঘরের বারান্দায় বসিলাম। সেদিন ঠাকুরের আদেশে একটি ভক্ত, অনন্ত সান্ত তত্ত্বের এমন অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, সকলে চমকিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি নিজে বহুদিন যাবৎ চিন্তা করিয়াও এ বিষয়ে কোনও সুমীমাংসা করিতে পারেন নাই, কিন্তু তখন অনায়াসে, অতি সরল ভাষায়, সমস্ত বলিয়া গিয়াছিলেন। পরে সকলে আশ্রম ঘরে গিয়া বসিলে, ঠাকুর ইঙ্গিতমাত্রে প্রত্যেক ভক্তের মুখে অতি উচ্চ জ্ঞানতত্ত্ব বাহির করিয়াছিলেন। একটি ভক্ত যে মুহূর্ত্তে যে কোনও চিন্তা করিতেছিলেন, ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাহা অপরের মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়া, তাঁহার প্রতি গভীর অর্থজ্ঞাপক দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তাঁহারা দুইজনে হাসিতে লাগিলেন—আর সকলে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। এইভাবে তিন চারি ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছিল।

পরদিন রাত্রে আমরা আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া, রাধিকা বাবুর ঘরে বসিলাম। সকলের সাধ হইল—ঠাকুরের গলায় স্বর্ণহার ও হাতে অনন্ত পরাইবেন। ঠাকুর সেদিন গৌর প্রেমে একেবারে আকুল হইয়া উঠিলেন। মুখে অপার্থিব লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল, ভাবাবস্থায় একটী নূতন গানের পদ আসিতে লাগিল :—

গৌর গৌর গৌর বলে এবার নাচিব।
গৌরহার গলে প'রে জীবকে মাতাব॥
অনন্ত হাতে দিয়ে অনন্তে মিশিব॥
ছেড়ে দিব তন্ত্রমন্ত্র, গৌর যন্ত্রী—আমি যন্ত্র,

যেম্নি বাজায় গৌর বলে তেম্নি বাজিব।
যেম্নি নাচায় গৌর বলে তেম্নি নাচিব॥

ইহার দুই এক দিন পরেই, ভাবাবেশে নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়াছিলেন :—

গৌরনাম মূলমন্ত্র জীবে প্রচারিব।
গৌরনামে গৌড়দেশ পাগল করিব॥
(গৌরনামে গৌর-দেশ পাগল করিব)।
গৌরনামে গেঁথে মালা পরিব গলায় গো।
গৌরনাম হৃদে লিখে লুটাব ধূলায় গো॥
গৌরনামে মাতাইব এই যে আমার সাধ গো।
গৌরনাম এই না যুগে মানুষ ধরার ফাঁদ গো॥
গৌর গৌর গৌর বলে নাচিব এবার গো।
গৌর বলে গৌরপ্রেমে ভাসাব সংসার গো॥
গৌর আমার নয়নতারা, গৌর আমার প্রাণ গো।
গৌর আমার জীবন যৌবন, গৌর আমার মান গো॥
গৌরনামে হৃদয় আমার দুরু দুরু করে গো।
গৌরনামে পাঁজর আমার খসে যেন পড়ে গো॥
গৌর নামে পাপীতাপীর হৃদয় শীতল হয় গো।
(যেমন) পরশমণির পরশেতে লোহা সোনা হয় গো॥

গৌরনামের পতাকাতে উড়াব নিশান গো।
গৌরনাম এইনা যুগে যুদ্ধেরি কামান গো॥
গৌরনামে পাগল হয়ে বাজাব বিষাণ গো।
গৌরনাম হাতে লয়ে করিব কৃপাণ গো॥

এই সময় তাঁহার অতি বিচিত্র ভাব—প্রায় মাসেককাল প্রাণের ভিতর দিয়া একটি প্রচণ্ড ভাবের তুফান বহিয়াছিল। নিজে সব দেখিতেছেন, সব বুঝিতেছেন, অথচ এক একটি ভাব আসিয়া চিত্তকে অধীর করিয়া—আকুল করিয়া তুলিতেছে। কোনও দিন চিন্তা, জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে উঠিয়া একেবারে অনন্তে মিশিয়া যাইতেছে, কোনও দিন মাতৃস্নেহে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও অপার প্রেমে চিত্ত উদ্বেল, কখনও বা দারুণ বিরহের মধ্যে, একটি নিবিড় মিলনের আনন্দ অনুভব করিতেছেন। এ অবস্থা ভাবাতীত—বর্ণনাতীত; কোনও গ্রন্থ পড়িয়া কল্পনা করাও অসম্ভব।

কোনও দিন বা পা' দুখানি অলক্তকরসে রঞ্জিত করিয়া—স্বর্ণহার গলায় পরিয়া, গৌর গৌর রবে নাচিতেছেন—অশ্রুজলে মুখ ভাসিয়া যাইতেছে; গাহিতেছেন—

"গৌর নাম মূল মন্ত্র জীবে প্রচারিব।
গৌর নামে গৌড়দেশ পাগল করিব॥"

কোনও দিন বা প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ভাবে বিবশ হইয়া উঠিয়াছেন—তখন একতারা হাতে লইয়া গান ধরিলেন—

"এবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি,
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি ॥

কোনও দিন বা গাহিতেন—

"মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব গো।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব গো ॥
যারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ গো।
অনলে পশিব কিম্বা জলে দিব ঝাঁপ গো ॥"

কথনও বা গাহিতেছেন—

"যার মনে লেগেছে যারে তারে ভজুক তারা গো।
মোর মনে লেগেছে শুধু শচীর দুলাল গোরা গো ॥"

আর মোহনভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন; সে গানে, সে নৃত্যে, সে আকুলতায়, সে উচ্ছ্বাসে পৃথিবীর ভাব কিছু নাই—সব দিব্য, সব অপার্থিব। কোনও দিন বা নিজহাতে তুলিকা লইয়া, ছোট ছোট মেয়েদের পা' দুখানি রঞ্জিত করিয়া, ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন।

একদিন বড় বিচিত্র সাধ হইল, সুরেন্দ্র ডাক্তারের ছোট ছেলেটীকে আসনে বসাইলেন। (ছেলেটীর নাম ব্রহ্মানন্দ—বয়স দুই বৎসর) গোলাপ ও স্থলপদ্ম দিয়া শিশুটীকে সাজাইয়া প্রণাম করিলেন—আর সকলকেও প্রণাম করিতে বলিলেন। পরে ধূপ-দীপ-বাদ্যে যথারীতি আরতি হইল। শিশুটী বড় চঞ্চল; কিন্তু সেদিন, সে স্থিরদৃষ্টিতে—গম্ভীরভাবে বসিয়া পূজা গ্রহণ করিল। ঠাকুর বলিলেন "ইনি আজ ব্রহ্মানন্দজী—সহজ ব্যক্তি নহেন।" পরে ব্রহ্মানন্দের ভোগ হইল। ঠাকুর স্বহস্তে,

শিশুকে সর সন্দেশ খাওয়ান, আর বার বার ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করেন। পরে বলিতে লাগিলেন "ব্রহ্মানন্দজীকেই এবার দেখাইব—দেখনা তীর্থযাত্রা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া কেমন আরম্ভ করেছে।......এই কয়দিন ব্রহ্মানন্দের শক্তিতেই কার্য্য হইতেছে......ব্রহ্মানন্দজীকে সকলে দেখিতে পায় না; কপাল ভাল থাকলে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ভাল থাকলে, দেখ্‌তে পারে" ইত্যাদি। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া, ছেলেটীকে লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকটী কথা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক—খুব অল্পলোকেই মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। সেদিন তাঁহার স্বরে এমন একটা স্নেহ ও আদরের ভাব মিশানো ছিল যাহা, কেউ কখনও শুনেন নাই; প্রকৃত আদরের ভাষা কি, স্বর কি, সেদিন সকলে তাহার কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন।

প্রতিদিন এইরূপ কত ঘটনা ঘটিয়াছে—এক এক দিনের ঘটনা বিস্তৃতভাবে লিখিতে গেলে এক একখানি গ্রন্থ হইয়া যায়—দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনার মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন দুই পূর্ব্বে ঠাকুর আশ্রমে চলিয়া যান, নানা স্থান হইতে অনেক ভক্তও সমবেত হইয়াছিলেন। এই সময় প্রেমানন্দ(১), অদ্বৈতানন্দ, কল্যাণানন্দ(২), রমানন্দ, কুমারানন্দ(৩) এবং বিপুলানন্দের দীক্ষা হয়। এবং কিছুদিন পূর্ব্বে, আদিনাথ ঘোষ(৪),

(১) নাম হরকিশোর বিশ্বাস, বয়স ৩৭, স্বামী চিদানন্দের অগ্রজ।

(২) নাম পূর্ণচন্দ্র এন্দ, হবিগঞ্জে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর আফিসে চাকুরী করেন, বয়স ২১ বৎসর, নিবাস হবিগঞ্জের অন্তগত পৈলগ্রামে।

(৩) নাম মহেন্দ্রচন্দ্র দেব, বয়স ২০ বৎসর, নিবাস হবিগঞ্জের অন্তর্গত চরহামুহা গ্রামে।

(৪) কৃষ্ণানন্দ, বয়স ৪৫ বৎসর, নিবাস ত্রিপুরা দৈয়ারা (ডাক্তার)।

যতীন্দ্রনাথ দত্ত(১), শ্রীশচন্দ্র সেন(২), জলধর ভট্টাচার্য্য(৩), চন্দ্রকিশোর বিশ্বাস(৪), ভবানীকিশোর বিশ্বাস(৫), সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য(৬), সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত(৭), ব্রজেন্দ্রনাথ গুহ(৮), কৃপানন্দ(৯), প্রভৃতির নামাকরণ করা হয় এবং শ্রীযুত দিগিন্দ্রনাথ দে(১০), আশ্রমবাসী হন। বিষুবসংক্রান্তি দিনই স্বামী হংসানন্দ ও চিদানন্দের অধীনে দুইটী সংকীর্ত্তনের দল গঠন করা হয়। এই কয়দিন আশ্রমে একটি উন্মাদ আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল, কীর্ত্তনে অসীম শক্তির বিকাশ হইয়াছিল।

ইহার ৩।৪ দিন পরে স্বামী হংসানন্দ নামপ্রচারে বাহির হন। তরুণ যুবক হংসানন্দ কাছাড় ও শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে যে বিপুল প্রেমস্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, স্থানবিশেষে যে অদ্ভুত শক্তির ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে, তাহা অনেক বিষয়ে মহাপ্রভুর যুগকেও অতিক্রম করিয়াছে। প্রচারবিবরণী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে; সুতরাং এস্থলে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

(১) ধর্ম্মানন্দ, বয়স ২৪, বাড়ী ত্রিপুরা নাটঘর।
(২) বিরজানন্দ, বয়স ২৬।২৭ বাড়ী ত্রিপুরা আন্দিউরা।
(৩) প্রকাশানন্দ, বয়স ৩২, বাড়ী বাণিয়াচঙ্গ।
(৪) দিব্যানন্দ, বয়স ২৩, বাড়ী বাণিয়াচঙ্গ।
(৫) কমলানন্দ, বয়স ১৭, বাড়ী বাণিয়াচঙ্গ।
(৬) ধীরানন্দ বয়স ১৯, বাড়ী ত্রিপুরা, বুড়ীচঙ্গ।
(৭) বিদ্যানন্দ, বয়স ২০, বাড়ী ত্রিপুরা, কালীকচ্ছ।
(৮) বিশুদ্ধানন্দ, বয়স ১৬, বাড়ী ঢাকা, বিক্রমপুর।
(৯) আশ্রমসেবক গুরুদাসবাবুর পুত্র—বয়স ১০ বৎসর, গুরুদাস বাবু এই বালকটিকে আশ্রমে দান করিয়াছেন।
(১০) অভেদানন্দ, পূর্ব্বে পাব্লিকওয়ার্কস্ ডিপার্ট্মেণ্টে একটিং সুপারভাইজারের কার্য্য করিতেন; স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের অগ্রজ—বয়স ৩২।৩৩ বৎসর।

সংক্রান্তির দুই তিন দিন পূর্ব্বে, ডিব্রুগড় হইতে একটী ছেলে আসিয়াছিল। তাহার মুখে শুনিয়াছি, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের বিহাড়া ষ্টেশনে আসিলেই, আশ্রম দেখিবার জন্য সে একটী প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। আশ্রমসেবক রুদ্রানন্দের* সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হওয়ায়, কৌতূহল আরও বাড়িয়া যায়। ছেলেটীর নাম গিরীন্দ্রনাথ শর্ম্মা (মনানন্দ), বয়স আনুমানিক অষ্টাদশ বৎসর, শ্রীহট্ট সহরের অদূরবর্ত্তী লক্ষ্মীপাশা গ্রামে বাড়ী।+ ছেলেটিকে দেখার পর হইতেই ঠাকুরের প্রাণে বাৎসল্যভাব উছলিয়া উঠে, দেহেও ঠিক মাতৃমূর্ত্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তা'কে বুকে রাখিয়া কত স্নেহ করিতেন, "আমার সোনা", "আমার ধন" বলিয়া কত আদর করিতেন—একত্রে খাইতেন, একত্র বসিতেন; মুহূর্ত্তেক চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ছেলেটিও একেবারে শিশুর মত হইয়া গিয়াছিল—রাত্রে বড় নিদ্রা যাইত না; শিশুর মত ঠাকুরের বুক চুষিতে থাকিত। ঠাকুরও তাহার জন্য পাগল—একদিন শেষ রাত্রে তিনটার সময় উঠিয়া, একতারা হাতে নিয়া তারাপুরে ভক্তদের বাসায় বাসায় যাইয়া গাহিলেন—

* নাম হেমন্তমোহন সিংহ, বয়স ২৫ বৎসর, হবিগঞ্জের অন্তর্গত রাঢ়ীশাল গ্রামে বাসস্থান।

\+ কীর্ত্তনে আশ্রমবাসী অনেকের ভাব হইতে দেখিয়া, প্রথমতঃ তাহার বড় অবিশ্বাস হইয়াছিল—ঠাকুরের নিকট নির্জ্জনে সে সন্দেহও প্রকাশ করিয়াছিল। "এতগুলি লোকের প্রত্যেকেই ভণ্ডামি করিতেছে বলিয়া যদি তোমার সন্দেহ হয়, তবে আমি আর কি বলিব? ভগবান যদি করেন তবে, এই মুহূর্ত্তেই তোমার বিশ্বাস হইতে পারে, এমন কি তোমার নিজেরও ভাব হইতে পারে।" ঠাকুর এই কথা বলিবামাত্রই, ছেলেটী ভাবস্থ হইয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল, এবং অবিশ্বাসের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল।

"জাগরে হরি ব'লে জীবগণ।
মোহমায়া নিদ্রাঘোরে কত রবে অচেতন ॥"

অনেকেই জাগিয়া আসিল—কীর্ত্তন চলিল। এমন সময় ঠাকুর বলিলেন "আমার মনাটা একেলা পড়িয়া আছে—দুধের জন্য বুঝিবা আই-ঢাই করিতেছে—এ'টাকে একটু শান্ত করিয়া আসি।" বলিয়া আবার সেই ঘরে চলিয়া গেলেন। "ঠাকুরের চরিত্র" অধ্যায়ে, মাতৃভাবের আরো দুইটি উজ্জ্বল চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সে দুইটী ঘটনাও এই সময়েই ঘটিয়াছিল।

অনেক সময় আবার পূর্ণ বিরহীর ভাব আসিত—তখন প্রেমোন্মাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইত। কখনও হাসিতেছেন, কখনও গাহিতেছেন, কখনও গৌর, গৌর বলিয়া নৃত্য করিতেছেন—আর চোখে অশ্রু ঝরিতেছে। দেহটী যেন বিরহানলে খিন্ন হইয়া যাইতেছে, শরীরের প্রতি রক্তকণা যেন যাতনাময় হইয়া উঠিয়াছে, মুখে বিষাদের কালোছায়া পড়িয়াছে—সে মুখ দেখিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। সত্যানন্দও তখন প্রায়ই আবিষ্ট থাকিতেন; ঠাকুর কোনও দিন অশ্রুভরা চোখে, গাহিতে গাহিতে তাহাকে বলিতেছেন :—

"মহাপুরুষ তুই শুনারে আমায়—
সেই সোনার নদের সোনার কথা তুই শুনারে আমায়,
সোনার নামে পাগল হয়ে তুই শুনারে আমায়,
সেই কাঁচা সোনা গোরার কথা শুনারে আমায়,
সোনার কথা শুনে, সোনা হয়ে যাব, তুই শুনারে আমায়!"

রাধিকা বাবু তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কথা—লীলাতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব এবং জ্ঞান ও প্রেমরাজ্যের আরও কত উচ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন—অতি সহজ ভাষায় বুঝাইতেছেন—"অনন্তে লীলা নহে, সান্তে আসিলেই লীলা; অনন্ত সান্ত হইলেও তাহার অনন্তত্ব খণ্ডিত হয় না—অবতার সচ্চিদানন্দ সাগরের চড়ার মত"—ইত্যাদি। ঠাকুর হেলিয়া দুলিয়া গাইতে লাগিলেন "এস গৌর প্রাণ গৌর" কীর্ত্তনের মাঝেই আবার ভাবাবেশ হইল—এবার রাধাভাব। গাহিতে লাগিলেন—

"বল বল সে কেমন আছে।
আমি যাহার তরে সব ছেড়েছি সে কেমন আছে।
কুললাজভয় সব ছেড়েছি সে কেমন আছে।"

এই অবস্থায় প্রায়ই কবিতায় কথাবার্ত্তা হইত—সকলের মনের কথা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, এইরূপ হইত। আর যাহাকে যাহা বলিতেন, এমন কি, মনে ভাবটী আসা মাত্রই সে তৎক্ষণাৎ তাহা করিত, যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত, সে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইত।

একদিন সুরেন্দ্র ডাক্তারের বাসায় কীর্ত্তন হইতেছিল—বড় উদ্দণ্ড কীর্ত্তন। ঠাকুর স্বর্ণহার গলায় পরিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতেছেন। ডাক্তারের মেয়ে প্রতিভার দিকে চাহিয়া গাহিলেন "প্রতিভা হবে—আজ বড় প্রতিভা হবে—গৌর নামের প্রতিভা হবে।" ডাক্তারের স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া গানের সুরে বলিলেন "তুই কি দিবে—সোনার হার দিবে, ঠিক বল কি দিবে, লাজ ছাড়িয়া বল কি দিবে।" একটু পরেই গাহিতে লাগিলেন "আমি গলার হার চাহি না—প্রাণপুষ্পে গাঁথা হার বিনে গলার

হার চাহি না—তোদের লাজ রয়েছে—লাজের মাথায় বাজ পড়ুকগে —তোদের লাজ রয়েছে—তোদের ঘৃণা লজ্জা ভয় ছাড়িতে হবে—আমার প্রাণগৌর পে'তে হলে, তোদের ঘৃণা লজ্জা ভয় ছাড়িতে হবে—কিছু কমিয়ে গেছে—তোদের লাজ মান ভয় কিছু কমিয়ে গেছে" যাই বলিয়াছেন "তোদের লাজ মান ভয় কিছু কমিয়া গেছে" অমনি মা, মেয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রী, সকলে ঠাকুরের পায়ে পতিত হইয়া, আকুল উচ্ছ্বাসে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, গৃহখানি তাঁহাদের ক্রন্দনের রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। গৃহে অন্যান্য যত লোক ছিল সকলেই কাঁদিতে লাগিল; ঠাকুর লক্ষ্য করিয়া ডাক্তারকে বলিলেন :—

"আজ তোমার ঘরে সূচনা হইল মাত্র—এই ভাবে সমস্ত জগৎ কাঁদবে—নরনারী সব গৌরনামে আকুল হয়ে কাঁদবে।"

তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—ঠাকুর ভাবস্থ হইলেন—গৌর প্রেমে আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতে লাগিলেন :—

"মহাপুরুষ তুই পাগল হয়ে যা,
গৌর গৌর গৌর বলে তুই পাগল হয়ে যা।"

আকুলতা বাড়িতে লাগিল—সত্যানন্দের বক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপন করিয়া আবার গাহিলেন :—

"মহাপুরুষ তুই পাগল হয়ে যা,
পাগল করিবি বলে তুই পাগল হয়ে যা;

একবার তুই শুনারে আমায়,
গৌর নামের মহিমা তুই শুনারে আমায়।”

প্রেমে বিহ্বল হইয়া—সত্যানন্দের বুকে মাথা রাখিয়া, অশ্রুধারায় বুক ভাসাইয়া গাহিতে লাগিলেন “বুঝি বোবা হয়েছিস—মহাপুরুষ তুই বোবা হয়েছিস—আমার করম দোষে বুঝি বোবা হয়েছিস—একবার শুনারে আমায়—প্রেমযুগের নামধন তুই শুনারে আমায়” ইত্যাদি। একদিন হংসানন্দকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল—তাঁহাকে আনিবার জন্য আশ্রমে লোক প্রেরিত হইল। সে যাইয়া দেখে, হংসানন্দ ও ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে শিলচর রওয়ানা হইতেছেন। যথাসময়ে হংসানন্দ ও মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাষ্টারকে (গিরিশচন্দ্র রায়) দেখিয়াই বলিলেন “মাষ্টার খবর কি?” মাষ্টার ভাবাবেশে “মা” “মা” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিবিড় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। এই সময় হরমোহন * আসিল—তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন “কি? তুমিও ব্যারাম চাও নাকি?” এই বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাগানুগা ভক্তির কথা উঠিল—কথা বলিতে বলিতে

* ইহার বাড়ী মৌলবীবাজার সবডিভিসনে, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে; বড় দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছিল, মদ গাঁজা ছাড়া কিছুই বুঝিত না। ঠাকুরকে দেখার পর হইতে প্রাণে বড়ই অনুতাপ আসে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে সাহস হইতেছে না; সে জন্য একদিন ইচ্ছা করিয়া মাতাল হইয়া আশ্রমে গিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে তাঁহাকে প্রাণের ব্যথা জানাইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; বিনা চেষ্টায় আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামাদি হইয়া যাইত; এখন সব নেশা ছাড়িয়া দিয়া ভগবানে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেছে।

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন—সত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতে লাগিলেন "মহাপুরুষ, আমার ভাল লাগে না—আমি প্রেমাগুনে জ্বলে মলেম্, আমার ভাল লাগে না।" কোনও দিন হেমেন্দ্র নামক একটী ছেলেকে দেখিবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে। অভিভাবকদের ভয়ে সে প্রায়ই আসিতে সাহস করিত না—কীর্ত্তনে যোগ দেয় বলিয়া, তাহাকে কত লাঞ্ছনা, তিরস্কার এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইত, তবু মাঝে মাঝে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। একদিন সে আসিয়াছে—ঠাকুরকে দর্শন করিতেছে—আর ভয়ে—আশায়—আনন্দে বুক কাঁপিতেছে। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া ভাবাবেশে তন্মুহূর্ত্তে রচিত এই সঙ্গীতটী গাহিতে লাগিলেন—

"চলিতে চরণ, চাহে না কখনো
পড়িনু কিবা ফাঁদে।
যতন করিয়া, হিয়ায় ধরিনু
(আমি) কাঁটা বিঁধিনু সাধে।

গাহিতে গাহিতে দেহ অবশ হইয়া উঠিল—গাহিতে লাগিলেন "দেহ অবশ হ'ল গো—প্রেমানলে পুড়ে মলেম, দেহ অবশ হ'ল গো—আরতো বশে রাখতে নারি, দেহ অবশ হ'লো। এস গৌর, প্রাণ গৌর।"

এই ভাবে, বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়া দিন যাইতে লাগিল। বিরহের মধ্যেও যে একটি নিবিড় আনন্দ আছে, তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে লাগিলেন। মাসেক পরে প্রাণের ভিতর তুফান থামিয়া গেল, প্রাণে

শান্তি আসিল—বিরহ-মিলনের অতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আস্বাদন পাইলেন।

এই সময় একদিন (১৫ই বৈশাখ—অমাবস্যা তিথি) আশ্রমে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় একটি কবিতা আসিতে লাগিল—কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, অনর্গল লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। কবিতাটী এই :—

সই! অমৃতে অমৃত এত।
অমৃত তৌলেতে, অমৃত মাপিয়া
বুঝি না অমৃত কত॥

অমৃত নিচয় মোর।
অমৃত পুরেতে, বসতি আমার
অমৃত প্রাসাদে ঘর।
অমৃত চাদরে, বিছানা আমার
অমৃত পালঙ্কোপর॥

অমৃতে ভোজন, অমৃতাচমন
অমৃতে শয়ন মোর।
অমৃত নিশায়, অমৃত নিশাতে
অমৃত স্বপন ঘোর॥

অমৃত স্বপনে, অমৃত প্রভাত ;
অমৃত বদন ভরি।
অমৃত আধারে, অমৃত লইয়া
মুখ প্রক্ষালন করি ॥

অমৃত পেয়ালে, অমৃত ভরিয়া
অমৃত সেবন করি।
অমৃত তারেতে, রাগিণী বাঁধিয়ে
অমৃতে অমৃত ধরি ॥

অমৃত লইয়া, অমৃত বাজারে
বিকাই অমৃত কত।
অমৃত পাইয়া, অমৃত দেখিয়া
অমৃত ভকত কত ॥

অমৃত বাতাসে, অমৃত পরশে
অমৃতে শীতল হই।
অমৃতে অমৃত, মিশিলে অমৃত,
যতনে রাখি গো সই ॥

অমৃত আমার, আমি অমৃতের
বুঝিয়া বুঝেনা সই।
শুনিয়া শুনেনা, দেখিয়া দেখে না,
তালাসে অমৃত কই॥

দয়াতে অমৃত, আনন্দে অমৃত,
অমৃত সকলি মোর।
অমৃত আঁখিতে, চাহিয়া দেখনা
অমৃতে হইবে পূর॥

অমৃত বলিয়া, অমৃত ভখিনু
অমৃতে হইনু ভোর।
অমৃত সাধিয়া, অমৃত হরিয়া
অমৃত হইল চোর॥

এমন সুমধুর ভাষায়, এত গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা, সাহিত্যে আর আছে কি না জানি না—অমৃত তারেতেই যেন রাগিণী বাঁধা। কিন্তু ভাষার মাধুর্য্য, কবিতাটীর বিশেষত্ব নয়। কবিতাটীতে কর্ম্ম, প্রেম ও জ্ঞানের সমন্বয় আছে; এবং কর্ম্মী, প্রেমিক, দার্শনিক—প্রত্যেকের জন্য একটী বার্ত্তা আছে।

কর্ম্মমাত্রের, এমন কি, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের ভিতর দিয়াও যে, একটী আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইতে পারে, কবিতাটীতে এ ভাবটী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনকালেও কেহ কেহ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে অবস্থাটা যে কিরূপ, তাহার কোনও আভাস দেন নাই। ঋষিপত্নী বলিয়াছিলেন—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ?" কিন্তু সংসারে থাকিয়া কি অমৃত লাভ করিতে, অমৃত হইতে পারে না ? জ্ঞানের আলোকে চাহিয়া দেখ, কিছুই অর্থহীন নয়, আর প্রেমে সমস্তই অমৃতময় হইয়া উঠে। অথচ ইহা যে অসম্ভব আদর্শ নয়, কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাহার প্রমাণ, তিনি তাঁহার সহজ অনুভূতির কথাইতো লিখিতেছেন।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের "পিরীতি নগরে বসতি করিব, পিরীতে বান্ধিব ঘর" এই কবিতারই অনুকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় কবিতা ভাষা ও ছন্দাংশে অনুরূপ হইলেও, একটী অন্যটীর অনুকরণ নহে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রেমের আদর্শ যেখানে গিয়া পৌছিয়াছে, এ তাহারও উর্দ্ধ অবস্থার কথা। বাস্তবিক, বিরহের অতীত একটী চিরমিলনের সঙ্গীত, বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও দেখি না—এমন কি রায় রামানন্দের সুবিখ্যাত "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" কবিতাটীর মধ্যেও এ ভাবের আভাস পাই না। এখানে হা হতাশ, দীর্ঘশ্বাস কিম্বা অনুযোগ নাই—

"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।

অমিয় সাগরে, সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥”

এ ভাবের কথাই নাই—এখানে আছে—

“অমৃত বলিয়া অমৃত ভখিনু
অমৃতে হইনু ভোর।”

এখানে প্রেমিক, প্রেম ও প্রেমাস্পদ; এমন কি, সজীব নির্জ্জীব সমস্ত প্রকৃতি, অমৃতে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে—অমৃত হইয়া গিয়াছে। প্রেমের এই প্রশান্ত, গাঢ়তম, ব্যাপকতম অবস্থাই অমৃত—ইহাই প্রেমের সীমা। এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহাতেই প্রেমাস্পদকে দেখিতেছি, তাহারই অমৃত উপভোগ করিতেছি; তবে আর বিরহ কোথায়?

কিন্তু এ অবস্থায়ও লীলার আনন্দ আছে, কারণ, বৈচিত্র্য আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, সমস্তই যদি অমৃত হইয়া গেল, তবে ব্যক্তিভাব থাকে কিরূপে? বৈচিত্র্য থাকে কিরূপে? ‘অমৃত তোল’, ‘অমৃতপুর’, ‘অমৃত ভার’ কিম্বা ‘অমৃত আঁখিরই’ বা স্থান কোথায়? আমরা যে একেবারে শঙ্করের নির্ব্বিশেষে পদার্পণ করিলাম।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে—ইহা নির্ব্বিশেষ অবস্থা নহে, কারণ, বৈচিত্র্যের মধ্যেও একত্ব থাকিতে পারে। বৈচিত্র্যকে কথার মারপেঁচ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব—ইহাকে অস্বীকার কর, কিম্বা ভ্রান্তিই বল—পদে পদে আবার স্বীকার না করিলেই চলে না। সুতরাং শঙ্করকেও বাধ্য হইয়া জগতের “ব্যাবহারিক” বলিয়া একটী সত্ত্বা স্বীকার করিতে হইয়াছে। কোনও কিছু “আছে” বলিলেই বুঝিতে হইবে,

কোনও না কোনও জ্ঞাতার জ্ঞানে আছে—জ্ঞানের বাহিরে সত্ত্বার আর কি প্রমাণ আছে? ক্যাণ্ট (Kant) যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, শঙ্করও সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াই, "পারমার্থিক" ও "ব্যাবহারিক" দু'টি সত্ত্বার ভেদ নির্ণয় করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে "ব্যাবহারিক" সত্ত্বাকে ভ্রান্তি বলিয়াই ধরিয়া নিয়াছিলেন। রামানুজ শঙ্করের ভ্রম দেখাইতে গিয়া, নিজেও পূর্ণসত্যটী দেখিতে পান নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ "কৃষ্ণে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়" (লঘুভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য) তত্ত্বটী স্বীকার করিয়া, একটী গভীরতর সমন্বয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। অনন্তে বিরুদ্ধভাব থাকিতে পারে—যাহা সীমাতীত, সম্পর্কাতীত, তাহার পক্ষে বিরুদ্ধভাব একই ভাব; সুতরাং তাহাতে বিরুদ্ধভাব থাকিতে পারে। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভাঃ।" অর্থাৎ কৃষ্ণে সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ, সাকার-নিরাকার দুই একাধারে আছে। তাঁহারা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখাইয়াছেন, যেমন সূর্য্যের বিম্ব ও তাহার কিরণমণ্ডল; সূর্য্যকে পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, উভয়দিক দিয়াই জানিতে হইবে। বাস্তবিক বৈষ্ণব দার্শনিকের কৃষ্ণ এবং জর্ম্মন দার্শনিকের অনন্ত (Absolute) এ দুয়ে তত্ত্বতঃ বেশী পার্থক্য নাই। শঙ্করের সময় হইতে ভারতীয় দর্শনে ক্রমোন্নতি হয় নাই, এরূপ মনে করা ভ্রম। শ্রুতির ভাগ বাদ দিলে, এ দেশের এবং উনবিংশ শতাব্দীর জর্ম্মন দর্শনে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ, শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, যুক্তির দিক দিয়া তত্ত্বটী প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন নাই; সুতরাং হেগেলীয় দর্শনে জ্ঞানের সঙ্গে সত্ত্বার সম্পর্ক

বিষয়ে যেমন অন্তর্দৃষ্টি দেখিতে পাই, বৈষ্ণব-দর্শনে তাহার একান্ত অভাব। গভীরভাবে চিন্তা করিলে কেবল কৃষ্ণে নহে—পদার্থ মাত্রেই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রেয় দেখা যাইবে। পদার্থমাত্রই একাধারে সান্ত এবং অনন্ত। সান্ত কি অনন্ত বলিব—তাহা জ্ঞাতার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। মনে করুন একটী গোলাপ ফুল, আমরা ইহাকে সান্ত বলিতেছি, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পূর্ণ নহে। নানা জনে ইহাকে নানা ভাবে দেখিতেছে, কবি ইহার সৌন্দর্য্য, শিল্পী ইহার গঠননৈপুণ্য, রাসায়-নিক ইহার উপাদান, পদার্থতত্ত্ববিদ বর্ণ—দৃঢ়তা—স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি ধর্ম্ম; গণিতজ্ঞ ইহার আকৃতি এবং পরিমাণ; জীব-তত্ত্ববিদ ইহার পত্র-পরাগাদির সংস্থান, প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া, জীব-জগতে ইহার স্থান, ক্রমবিকাশাদি; দার্শনিক ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়ের কার্য্য কারণাদি বিষয়ে, কত প্রশ্ন তুলিতেছেন। ব্যবসায়ী কি দেখিতেছে? ইহাকে কোনও কাজে লাগানো যাইতে পারে কি না, ইহা হইতে কোনও সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে কি না, সংক্ষেপতঃ, ইহা হইতে অর্থাগমের কোনও পথ আবিষ্কার করা যাইতে পারে কি না। আর একজন মূর্খ লোক হয়তঃ, ফুলটির গন্ধ ছাড়া আর বড় বেশী কিছুর ধার ধারে না; ফুলটির নাম, গন্ধ, বর্ণ, আকৃতি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান ছাড়া আর যে কিছু প্রশ্ন করিবার আছে, তাহার মনেই এ চিন্তা আসে না।

এইরূপে একটী জিনিষকে অনন্তভাবে দেখা যাইতে পারে; অথচ সমস্ত জানাতো দূরের কথা—একটী প্রশ্নেরও সম্পূর্ণ উত্তর কেহই দিতে পারে না; সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ভিতর দিয়া দেখিলে কোনও কালেই দিতে পারিবে না। ফুলের কথা ছাড়িয়া দিন—একটী ধূলিকণার নিকট

মহাজ্ঞানীর জ্ঞানও প্রতিহত হইয়া আসে; একটী ধূলিকণাকে সম্পূর্ণ-রূপে জানিতে হইলে, সমগ্র বিশ্বকে পূর্ণভাবে জানা প্রয়োজন।

সামান্য দৃষ্টিতেই দেখুন, বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণু মাধ্যাকর্ষণ নিয়মে, ইহার প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে; বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর সঙ্গে—ইহার প্রত্যেক পরমাণুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সে সম্পর্ক না বুঝিলে, ইহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান না থাকিলে, ইহাকে যথার্থরূপে বুঝা যায় না। আর এক পদ অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে, একটী পরমাণুর পর্য্যন্ত যথার্থজ্ঞান আমাদের নাই—অন্য কথা দূরে থাকুক, পরমাণুটির অবস্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা আমাদের শক্তির অতীত।* অথচ বিজ্ঞান কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানের এমন কোন প্রশ্নই নাই যাহা, এই পরমাণুটিকে অবলম্বন করিয়া না উঠিতে পারে। সুতরাং একটি পরমাণুর পূর্ণজ্ঞান, আর অনন্তজ্ঞান—একই কথা।

এইরূপ যে সূত্রেই আরম্ভ করুন না কেন, অনন্তজ্ঞানে পৌছিতেই হইবে। সুতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, একটি ধূলিকণা, একটি গোলাপফুল কিম্বা সমগ্র বিশ্বের পূর্ণজ্ঞান, সমগ্র বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ জ্ঞান, কিম্বা অনন্তজ্ঞান—একই কথা। অথচ জ্ঞানের বাহির পদার্থের পদার্থত্ব কোথায়? জ্ঞানের চক্ষে গোলাপ [illegible]টিই অনন্ত, এবং

* অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, একটি স্থির বিন্দু হইতে নির্দ্দিষ্ট দিকে দূরত্ব, কিম্বা তিনটী স্থির বিন্দু হইতে দূরত্ব নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। বিশ্বের কোথাও এইরূপ একটি স্থির বিন্দু পাওয়া অসম্ভব। আর দূরত্বনির্দ্দেশ সম্পূর্ণরূপে যন্ত্র ও পর্য্যবেক্ষণের নির্দ্দোষিতার উপর নির্ভর করে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসাহায্যে যে কিরূপ সূক্ষ্ম পরিমাপ সম্ভবপর, এক শতাব্দী পূর্ব্বে হয়তঃ তাহা কল্পনা করাও দুরূহ হইত, কিন্তু প্রতিদিন যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে—ইহার সীমা কোথায়? পর্য্যবেক্ষণের ভ্রান্তিতো অনিবার্য্য।

জ্ঞেয় মাত্রই স্বরূপতঃ অনন্ত। (অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান কিম্বা অনন্তজ্ঞানের চক্ষে) স্বরূপতঃ কৃষ্ণ যাহা একটি পরমাণুও তাহাই।

গোলাপফুলটিকে যে সান্ত বলিতেছি, এর অর্থ—অনন্ত জ্ঞান এখানে সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে—প্রকাশ হইতে হইলেই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের ভিতর দিয়া, দেশ কাল নিমিত্তের মধ্য দিয়া হইবে, সুতরাং বৈচিত্র্য আসিবে। অনন্তের সান্ত ভাবে প্রকাশিত হওয়াই লীলা। লীলার জন্য সান্ত ভাবে প্রকাশিত হইলেও, অনন্তের অনন্তত্ব খণ্ডিত হইতেছে না, কারণ, একটি সান্ত পদার্থই নানা জনের নিকট নানা ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। জ্ঞানের পরিধি যতই বাড়িবে, প্রকাশও ততই বড় হইবে; পূর্ণজ্ঞানের নিকট একটি পরমাণুরও প্রকাশ অনন্ত হইয়া উঠিবে, এবং প্রতি মুহূর্তেই অনন্ত থাকিয়া যাইবে; তখন প্রকাশ আর স্বরূপে কোনই পার্থক্য থাকিবে না। পদার্থ মাত্রই একাধারে সান্ত (প্রকাশ ভাবে) এবং অনন্ত (স্বরূপতঃ) এ কথার অর্থ—একই অনন্তজ্ঞান, বহু সান্তের মধ্যে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে, একই ভগবান বহু সান্ত হইয়া লীলা করিতেছেন—তিনিই বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত বৈচিত্র্যের পশ্চাতে একত্বের মূলতত্ত্ব ইহাই—সমস্ত সমন্বয়ের মূলতত্ত্বও ইহাই।

একদিকে যেমন দেখিতেছি, অবতার কিম্বা গুরুবাদ যুক্তিবিরোধী নহে, কারণ, তাহাতে অনন্তের, অনন্তত্ব খণ্ডিত হইতেছে না—অন্যদিকে তেমনি দেখিতেছি—পূর্ণ অবতার, এ কথার কোনও অর্থ নাই—পূর্ণজ্ঞানের চক্ষে, ধূলিকণা পর্য্যন্ত পূর্ণ অবতার। আর এই যে বৈচিত্র্য-সমন্বিত এক,

তাঁহাকে ভগবানই বল, আর যাহাই বল, এ যুগের মানুষ তাঁহাকেই খুঁজিতেছে—এ যুগের দর্শনে, জীবতত্ত্বে, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্ম্মসমন্বয়ের মধ্যে, বৈচিত্র্য-সমন্বিত একের আদর্শই ফুটিয়া উঠিতেছে, অমৃত আঁখিতে চাহিয়া দেখিলে, সমস্ত বৈচিত্র্যকেও তাহাই অমৃতময় করিয়া তুলিবে—তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সর্ব্ববিরোধের সমন্বয় হইবে—অমৃত কবিতার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্ত্তা।

সমাপ্ত।